স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালী

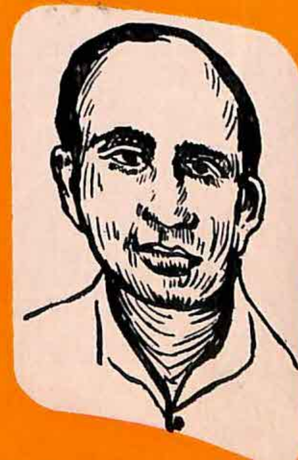












স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালী

শ্রীশেখর নিয়োগী

শ্রী প্রকাশনী
৭, নবীনকুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
অমল কান্তি দাস
৭, নবীনকুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

[নূতন সংস্করণ — ১৯৮৯]

মূল্য ঃ ১০.০০

মুদ্রাকর ঃ
মিরবহর প্রেস
কলিকাতা--৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

মাতৃ-মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র



বাংলার গৌরব সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। যখন তাঁহার সমবয়সীরা খেলাধূলা করিয়া বেড়াইত তখন তিনি ঘরে বসিয়া আপন মনে পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার সঙ্গীরা ইহাতে তাঁহাকে ঠাট্টা করিত, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত সত্যপরায়ণ ছিলেন। কেহ কখনও মিথ্যা কথা বলিলে তিনি তাহার প্রতি রাগ করিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য সহপাঠীদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ভাব ছিল। শিক্ষক মহাশয়গণও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে দুইজন প্রথম বি. এ. পাস করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বি. এ. পাস করিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করেন। তাঁহার প্রথম কর্মস্থল ছিল যশোহর। ইহার পর তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। প্রত্যেক জায়গাই তিনি তাঁহার কর্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

অসামান্য প্রতিভা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন। তাঁহার সৃজনী-প্রতিভা ছিল বহুমুখী। উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস-রচনা যেখানেই তিনি হাত দিয়াছেন, সেখানেই সোনা ফলাইয়াছেন। তাঁহার অমর লেখনী-স্পর্শে বাংলা ভাষা এক সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচার করিয়া দেশবাসীর নিকট নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন দেশের যুবসম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করিতে ব্যগ্র। তাহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাহাদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির অভাব দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা স্বদেশবাসীকে স্বদেশানুরাগী করিতে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার রচনার প্রধান উৎস ছিল স্বাদেশিকতা। তিনি স্বদেশকে মাতৃস্বরূপা জ্ঞান করিতেন। তিনি তাঁহার রচনায় জন্মভূমিকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনার মাধ্যমে যে আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন উহা শুধু বাঙ্গালী নয়, সমস্ত ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি তাঁহার রচনার মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন গৌরবের কাহিনীও অতি আকর্ষণীয় ভাষায় দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। তিনি স্বদেশপ্রীতিকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বজাতির শৌর্য ও বীর্য পুনরায় জাগ্রত করা। তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে শুধু দেশভক্তির আদর্শ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিরূপ অনুশীলন দ্বারা স্বদেশের মুক্তি সম্ভব উহারও আভাস দিয়াছিলেন।

তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস সু-পরিস্ফুট। তাঁহার রচিত সর্বজন-বিদিত 'আনন্দমঠ' বাঙ্গালী জাতিকে জাতীয়তা-বোধের দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল। তিনি উহাতে পরোক্ষভাবে অত্যাচারী বিদেশী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার ইঙ্গিত করিতেও দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার এই অমূল্য রচনার মধ্য দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন কি করিয়া দেশকে ভালবাসিতে হয় এবং কি করিয়া দেশের

স্বাধীনতার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। দেশকে প্রণতি জানাইবার জন্য 'আনন্দমঠের' সন্তানদিগের মুখে তিনি যে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র দিয়াছিলেন, উহা দেশাত্মবোধের বীজমন্ত্র। এই গ্রন্থের সন্তানদলই পরবর্তীকালে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী সৈনিকদের অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল। আজ সেই মন্ত্রই আমাদের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হয়। আজ বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্', মন্ত্র সার্থক হইয়াছে। দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আমাদের পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত অনেকে সংগ্রাম করিয়াছেন—কেহ অসির সাহায্যে, কেহ মসীর (লেখনীর) সাহায্যে। মসীবীর বঙ্কিমচন্দ্রের দান এ বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য শেষ জীবনে মোটেই ভাল ছিল না। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বহুমূত্র রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আজ ইহজগতে নাই বটে, কিন্তু যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে।

অনুশীলনী

১। কাঁহাকে সাহিত্য-সম্রাট বলা হয়? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কি জান?

৩। বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ?

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ সম্বন্ধে কি জান?

৫। 'বন্দেমাতরম্' সংগীত কে রচনা করিয়াছিলেন? ইহা কিসের সংগীত?

৬। বঙ্কিমচন্দ্র কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কি রোগে মারা যান?

৭। ডান দিকের সঠিক শব্দটি আনিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর:

(i) বঙ্কিমচন্দ্র—খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (১৮৩৮/১৮৫০)

(ii) বঙ্কিমচন্দ্র—ছিলেন। (কবি-সম্রাট/সাহিত্য-সম্রাট)

(iii) তাঁহার রচিত—স্বদেশবাসীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। (কপালকুণ্ডলা/আনন্দমঠ)

(iv) বঙ্কিমচন্দ্রের - খ্রীষ্টাব্দে বহুমূত্র রোগে মৃত্যু হয়। (১৮৯৪/১৮৯০)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ



১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর কলিকাতার তালতলায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিখ্যাত ডাক্তার। ছাত্র-হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি বিলাত গমন করেন। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে আই. সি. এস পাস করিয়া ২৩ বৎসর বয়সে শ্রীহট্টের (বর্তমান বাংলাদেশ) সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। এই তরুণ ও স্বাধীনচেতা বাঙ্গালীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জনপ্রিয়তা দেখিয়া সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হন। তাহার ষড়যন্ত্রে সুরেন্দ্রনাথকে সেই চাকরি হারাইতে হইল। ইহার পর তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে (পূর্বতন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসন্) ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি অধ্যাপক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁহার বাগ্মিতাও ছিল উচ্চস্তরের। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার দরুন তাঁহাকে 'প্রাচ্যের বার্ক' বলা হইত অর্থাৎ তাঁহাকে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বার্কের সহিত তুলনা করা হইত। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি থাকিলেও তিনি শিক্ষাকে সর্বোচ্চে স্থান দিতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষাব্রতী। সুদীর্ঘ ৪১ বৎসর তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাই

তাঁহাকে রাষ্ট্রগুরু আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশের ছাত্র ও তরুণদের দেশপ্রীতি জাগরণের উদ্দেশ্যে আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন করেন এবং বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি এই পত্রিকায় হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি নরিথ সাহেবের একটি আদেশ সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেন। ইহার ফলে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। অতঃপর তাঁহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহার পরিচালিত কাগজের সুনামও ছড়াইয়া পড়ে।

১৯০৫ সালে ২০শে জুন বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করেন ক্রূর ইংরেজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জন। এই বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় উহার অন্যতম নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই তিনি বাংলা তথা সর্ব ভারতের প্রথম বরেণ্য নেতা রূপে পরিচিত হন। তখন হইতেই প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই তীব্র আন্দোলনের ফলে সাত বৎসর পর বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল এবং দুই বাংলা এক হইল। দেশের মানুষ সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ সংগঠন শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিল।

প্রথম হইতেই জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। তিনি দুইবার উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। তিনি ছিলেন নরমপন্থী। অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চরমপন্থীদের উদ্ভব হইলে নরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তেজস্বী ও নির্ভীক নেতা। তিনি ছিলেন অসাধারণ সময়-নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। কলিকাতা পৌরসভাকে একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা তাঁহার এক অসাধারণ কর্মকীর্তি।

চরমপন্থী কংগ্রেসীরা নরমপন্থী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধাচারণ করিতে লাগিলে সুরেন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পর এই কর্মবীর ব্যারাকপুরে তাঁহার বাসভবনে ৭৭ বৎসর বয়সে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

অনুশীলনী

১। সুরেন্দ্রনাথ কত খৃষ্টাব্দে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

২। তিনি কিরূপ ছাত্র ছিলেন ?

৩। সুরেন্দ্রনাথ কত বৎসর বয়সে এবং কেন বিলাত গিয়াছিলেন ?

৪। সুরেন্দ্রনাথকে 'রাষ্ট্রগুরু' বলা হয় কেন ? কেন তিনি সরকারী চাকরি হইতে অপসারিত হন ?

৫। সুরেন্দ্রনাথ যে পত্রিকা সম্পাদন করিতেন উহার কি নাম ছিল ? কেন তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল ?

৬। কে বঙ্গভঙ্গ করেন ? ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের কিরূপ ভূমিকা ছিল ?

৭। কাঁহাকে প্রাচ্যের বার্ক বলা হয় এবং কেন ?

৮। সুরেন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতি হইতে কেন অবসর গ্রহণ করেন ?

৯। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ কর্মকীর্তি কি ?

১০। **নীচের সঠিক বাক্যটির পাশে ✓ চিহ্ন দাও :—**

(i) সুরেন্দ্রনাথ মেধাবী/অমেধাবী ছাত্র ছিলেন।

(ii) সুরেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার/ডাক্তার ।

(iii) সুরেন্দ্রনাথ দুইবার/তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি হন ।

(iv) সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন কলিকাতায়/ঢাকায় ।

(v) সুরেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন ১৯২৫/১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ।

স্বদেশ-প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ

'আগুন যেমন ছাই চাপা দিয়া রাখা যায় না, প্রতিভাকে সেইরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। সুযোগ পাইলেই উহার বিকাশ ঘটে। নইলে কে বলিতে পারে, যে ছেলেকে দিবারাত্র চাকর-বাকরদের কঠোর তত্ত্বাবধানে রাখা হইত, তিনিই পরবর্তীকালে 'বিশ্বকবি' নামে সুপরিচিত হইবেন।

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার অতি বিখ্যাত। ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। দেবেন্দ্রনাথ ধনে, মানে, শিক্ষায় এবং সর্বোপরি সচ্চরিত্র ও ধার্মিকতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পিতার অনেক সদগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি করানো হইল। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার মন বসিত না। কাজেই বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষকের নিকট তাঁহার পড়া-শুনার ব্যবস্থা করা হইল। শৈশব কালেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে।



সতের বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাত গমন করেন। সেখানে ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশের আলো ও বাতাস পাইয়া তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি ইচ্ছামত কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন বিশ্বের বিস্ময় 'গীতাঞ্জলি'। এই গীতাঞ্জলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। ইহার ফলে সারা বিশ্বে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি পাইল। বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। পৃথিবীর চারিদিক হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অতঃপর তিনি চীন, জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া বিশ্বপ্রেমের অমৃত বাণী শুনাইতে লাগিলেন।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দান ছিল। তিনি ছিলেন আদর্শ দেশানুরাগী। তিনি সর্বতোভাবে দেশের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে উহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার উপায়েরও তিনি ইঙ্গিত দিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি তাঁহার অমর লেখনীর সাহায্যে দেশবাসীর মধ্যে প্রাণের জোয়ার আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় ভারতের অতীত যুগের বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের কাহিনী তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশকে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের হাত হইতে মুক্ত করিতে হইলে সকলের আগে দরকার নিজেদের মধ্যে ঐক্য। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন দেশকে বিভক্ত করিলেন। মাতৃস্বরূপা বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে দেশময় আন্দোলন আরম্ভ হইল। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি উহার প্রতিবাদে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও স্বদেশ-মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্ন-স্বরূপ রাখীবন্ধন এই

কৃত্রিম বিচ্ছেদকে অস্বীকার করিবে। তিনি উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু গান রচনা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখী-সঙ্গীত সেদিন বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিল। সেদিন সহস্রজনের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল ঃ

(১) বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক এক হউক হে ভগবান।

(২) "ভাই ভাই এক ঠাই ভেদ নাই, ভেদ নাই।"

তাঁহার রচিত সঙ্গীত দেশবাসীর মনে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিল। তাহারা মাতৃভূমির ঐক্য অটুট রাখিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। অবশেষে এই আন্দোলন সফল হইল। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সরকার এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। এই হত্যাকাণ্ডের খবর শুনিয়া মানবপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই ঘটনায় দেশবাসী তাঁহাকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল।

পৃথিবীর সুসভ্য জাতিসমূহ ইংরেজদের এই বর্বরতাকে ধিক্কার জানাইল। বিশ্বকবি উদাত্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

"বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য, সে কি
ধরার ধূলায় হবে হারা ?"

রবীন্দ্রনাথ শৈশবকাল হইতে সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'জনগনমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য-বিধাতা' গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আজ ঘরে-ঘরে তাঁহার এই গান গীত হয় এবং দেশবাসীর মনে স্বদেশানুরাগের প্রেরণা যোগায়।

শুধু কবিতা নয়, গল্প, নাটক, উপন্যাস সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি সমাজ-সেবীও ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী ও জ্ঞানের সাধক। শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহার দানের তুলনা মিলে না। বীরভূম জেলার বোলপুরে শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহা আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী।

১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ এই সত্যসাধক ও দেশপ্রেমিক মহাকবি আশি বৎসর বয়সে মর্তধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি আজ ইহজগতে নাই, কিন্তু যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম চিরদিন আমাদের প্রেরণা দান করিবে। এমন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শুধু বাংলার গৌরব ছিলেন না, সারা পৃথিবীর গৌরব ছিলেন। আমরা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত।

অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম কি? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
২। রবীন্দ্রনাথ কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? তাঁহার শৈশব-শিক্ষা-সম্বন্ধে কি জান?
৩। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কখন এবং কি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন?
৪। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে কি জান?
৫। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ-কীর্তি কি? সে সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৬। রবীন্দ্রনাথের রচিত কোন্ গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে?
৭। রবীন্দ্রনাথ কোন্ সনের কোন্ তারিখে মারা যান?

সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ



স্বদেশ সেবায় যাঁহারা ব্যক্তিগত অর্থ ও সুখস্থবিধা বিসর্জন দিয়া আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত বন্ধু। চিত্তরঞ্জন দাশ উপরিউক্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন বলিয়া দেশবাসী তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বাংলার ঘরে-ঘরে সুপরিচিত। বাংলা মায়ের এই কৃতী-সন্তান ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাশ ছিলেন একজন খ্যাতনামা এটর্নী। তাঁহার আয় ছিল যেমন প্রচুর হৃদয়ও ছিল তেমন মহৎ। দান-ধ্যানের বেলায়ও তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলে আইন অনুযায়ী তাঁহার ঋণের টাকা শোধ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য পুত্র চিত্তরঞ্জন পাওনাদারদের ডাকিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। পাওনাদারগণ চিত্তরঞ্জনের সততা ও পিতৃভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন যে সততার এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

চিত্তরঞ্জন ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে বি. এ. পাস করেন। অতঃপর তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময় দাদাভাই নওরোজী বিলাতে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ-প্রার্থী হইলেন। একজন ভারতীয় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হইবে, ইহা ইংরেজদের সহ্য হইল না। তাহারা উহার বিরুদ্ধে নানাভাবে কুৎসা রটনা করিল এবং ভারতবর্ষকে কালো আদমীর দেশ বলিয়া অভিহিত করিল। চিত্তরঞ্জন ইংরেজদের এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ

হইয়া লণ্ডনে এক বিরাট প্রতিবাদ সভার আয়োজন করিলেন। সেই সভায় তিনি ইংরেজনীতির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দেশকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ইংরেজ শাসকগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার যে অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল উহা ফিরাইয়া লওয়া হইল। অতঃপর চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং যথাসময়ে উক্ত পরীক্ষায় পাস করিয়া স্বদেশের বুকে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া চিত্তরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় আলিপুরে বোমার মামলা আরম্ভ হইল। এই মামলায় যাঁহারা আসামী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদের অন্যতম। চিত্তরঞ্জন তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মামলা চালাইতে লাগিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সওয়াল করিবার সময় চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "আজ যে লোকটি আসামীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছেন, তিনি একজন অসামান্য ব্যক্তি। বাহিরের বহু বিরূপ ঘটনা এবং মনের অনেক বিরুদ্ধ ভাব আসল মানুষটিকে লোক-চক্ষুর আড়াল-করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন সেই-সব ঘটনা থাকিবেনা, মনের উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া যাইবে, সেদিন সত্যকার মানুষটি আমরা দেখিতে পাইব। সে দিন তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সারা দেশের লোক, এমন কি, দূর দেশের লোক অবধি কান পাতিয়া থাকিবে।" শ্রীঅরবিন্দের আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনা-কালে চিত্তরঞ্জন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা ও আইন-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবীদের আরো অনেকে মুক্তিলাভ করিলেন। বিচারক রায় লিখিবার সময় চিত্তরঞ্জনের আইন-জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই চিত্তরঞ্জন হইলেন দেশের সেরা ব্যারিষ্টার। তাঁহার পসার ও প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতির চরম শিখরে উন্নীত হইলেন।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া চিত্তরঞ্জনের দিন পরম সুখেই অতিবাহিত হইতেছিল। অর্থ, যশ, মান কোন কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না।

এবার শুরু হইল তাঁহার ভোগ-বিলাসের পালা। তিনি দেশে ভোগী ও বিলাসীদের আদর্শ হইয়া উঠিলেন। এমন সময় ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী 'অসহযোগ আন্দোলন' আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অসহযোগ আন্দোলন সফল করিতে হইলে সকল আইনজীবীকে আদালত ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা চলিবে না। দেশের কাজে সর্বস্ব দান করিতে হইবে।"

স্বাধীনতার স্বপ্নে যাঁহার হৃদয় একবার মাতিয়া উঠিয়াছে, অর্থ তাঁহাকে বেশীদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রেও উহার অন্যথা হইল না। গান্ধীজীর আহ্বান তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি রাজার মত বিভব ও বিলাস পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি সমস্ত বিলাতী জিনিস, বিলাস ও যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক নিমেষে ফকির সাজিলেন। দেশের লোক বিস্ময়ে হতবাক হইল। তিনি দেশের জন্য দারিদ্র্য, কারাবাস ইত্যাদি সব রকম কষ্ট প্রশান্তচিত্তে ও হাসিমুখে বরণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা 'দেশবন্ধু' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ লাভ করিয়া কলিকাতাবাসীর উন্নতির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশের যুব সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ছাত্ররাও তাঁহার প্রচারিত দেশাত্মবোধের মন্ত্রে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। ভারতের পরাধীনতার শৃংখল মোচনে তাঁহার অবদান অতুলনীয়।

কংগ্রেসের সহিত তাঁহার নীতিগত বিরোধ দেখা দিলে তিনি 'স্বরাজ্য দল' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সেই দলের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। পরে এই স্বরাজ্য দল কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবনও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী হিসাবেই আরম্ভ হইয়াছিল।

দেশপ্রেমিক, দাতা, ত্যাগী ও ব্যারিষ্টার-শ্রেষ্ঠ—ইহাই শুধু চিত্তরঞ্জনের

পরিচয় নয়, কাব্য ও সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান কম নয়। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠ দেশসেবকরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি কলিকাতার নিজ বাস ভবনটি পর্যন্ত জন-কল্যাণের উদ্দেশ্যে দান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে উহা 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন' নামে পরিচিত। দেশের সেবায় বার-বার কঠোর পরিশ্রম করার দরুন অবশেষে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি দার্জিলিং গমন করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও ভাঙিয়া গেল এবং অবশেষে তিনি সকলকে কাঁদাইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অন্তরের কথা লিখিয়াছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

বাস্তবিকই মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যায় না। কালের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের চিন্তাধারা মানব জাতিকে যুগে-যুগে মহৎ প্রেরণা জোগায়।

অনুশীলনী

১। 'দেশবন্ধু' বলিতে কাঁহাকে বুঝায়? তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' বলা হয় কেন?
২। চিত্তরঞ্জনের বিদ্যাশিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৩। একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া চিত্তরঞ্জনের দানশীলতার পরিচয় দাও।
৪। ব্যারিষ্টার হিসাবে চিত্তরঞ্জন কিরূপ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন?
৫। কংগ্রেসের সহিত মতান্তর ঘটায় চিত্তরঞ্জন কোন্ রাজনৈতিক দল গঠন করিয়াছিলেন? রাজনীতিক্ষেত্রে সেই দলের ক্ষমতা ছিল কিরূপ?
৬। চিত্তরঞ্জনকে দেশপ্রেমিক বলা হয় কেন? তিনি দেশের জন্য কি করিয়াছিলেন? তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য কে ছিলেন?

অগ্নিযুগের শ্রীঅরবিন্দ



১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁহার আদি নিবাস ছিল কোন্নগর। তাঁহার পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে পুত্রগণকে আদর্শ ইংরেজী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। অরবিন্দ শৈশবে কিছুদিন দার্জিলিং সেন্ট পল্‌স্ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া সতের বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং দশম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু অশ্বারোহণ-বিদ্যার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ট্রাইপশে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বরোদার রাজ কলেজে প্রথমে অধ্যাপক হন ও পরে সহকারী অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। বরোদা রাজ কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান হইয়া দেশমাতাকে পরাধীনতার শৃংখল হইতে মুক্ত করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তিনি বিদেশে শৈশব ও যৌবনের একাংশ অতিবাহিত করা সত্ত্বেও মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে একদিনের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। তিনি সুদূর বিদেশে থাকিয়াও স্বাধীনতা ও স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইউরোপবাসীর স্বাধীনতার স্পৃহার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। দেশে ফিরিয়া তিনি স্বদেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁহার মধ্যে ছিল এক দিব্য জীবনের প্রবাহ

দেশমাতার প্রতি ছিল তাঁহার অচলা ভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানদলের ভাবাদর্শ তাঁহাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশকে মুক্ত করিতে হইলে সক্রিয় আন্দোলন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশমাতাকে তিনি মাতৃরূপে বর্ণনা করেন এবং তাঁহার মুক্তির জন্য তিনি জাতিকে যে-কোন মূল্য দিতে বলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বরোদা হইতে বাংলায় আসেন এবং উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইহার মাধ্যমে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বিচক্ষণ অধ্যক্ষতায় উক্ত পত্রিকা অবিলম্বে জনসমাজে অত্যধিক সমাদর লাভ করে। এই সময় হইতে তাঁহার যশঃ ভারতময় ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা, ভাবের গভীরতা ও যুক্তির সারবত্তায় সকলেই মুগ্ধ হন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর তিনি কিছুদিন যুগান্তর পত্রিকার সন্ত্রাসবাদী প্রচার-কার্য ও সংগঠনের সহিত যুক্ত হন।

অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের জনক। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজদ্রোহী-ও ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধৃত হইয়া বন্দী হন। আলীপুরে বোমার মামলায় অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত তাঁহার বিচার হয়। বিচারের সময় তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়। তাহা হইলে আমি সেই অপরাধে অপরাধী।" এই মামলায় বিখ্যাত ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তিতে এবং কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আদালতের বিচারে অরবিন্দ সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

অতঃপর অরবিন্দ রাজনৈতিক ও সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পণ্ডিচেরীতে নির্জনে ভগবৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করেন এবং 'শ্রীঅরবিন্দ' নামে বিশ্বপরিচিতি লাভ করেন। অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবী,

যোগী, ঋষি। তাঁহার সাধনার লক্ষ্য মানবজাতির মুক্তি। তাঁহার অধ্যাত্মশক্তি ও দূরদৃষ্টি ছিল অসামান্য। তাঁহার তুল্য উদারচেতা, বিদ্বান, আত্মত্যাগী ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সমাধিস্থ অবস্থায় দেহরক্ষা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

অনুশীলন

১। শ্রীঅরবিন্দ কে ছিলেন? তাঁহার পিতার নাম কি? অরবিন্দ কোথায় এবং কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

২। শ্রীঅরবিন্দের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৩। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হইয়াছিল? তিনি কিভাবে অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইলেন?

৪। শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ-প্রীতি সম্বন্ধে কি জান?

৫। শ্রীঅরবিন্দের শেষ জীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ?

৬। **ডান দিক হইতে সঠিক শব্দটি আনিয়া শূন্য স্থানে বসাও :—**

(i) অরবিন্দ — সনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। (১৮৯০/১৮৯২)

(ii) তাহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল — ভাবধারা। (বিবেকানন্দের/রামকৃষ্ণের)

(iii) তিনি আন্দোলন — করিয়াছিলেন। (সক্রিয়/নিষ্ক্রিয়)

(iv) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ — পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। (যুগান্তর/বন্দেমাতরম্)

(v) অরবিন্দ শেষ জীবনে — ভগবৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। (চন্দননগরে/পণ্ডিচেরীতে)

২

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা



মাতঙ্গিনী হাজরা

ভারতকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যাঁহারা অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাতঙ্গিনী হাজরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুর জেলার একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম হোগলী। এই গ্রামের অধিকাংশই ছিল চাষী পরিবার। এখানে ঠাকুরদাস মাইতি নামে জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি কায়ক্লেশে সংসার চালাইতেন। ১৮৬৯ সাল ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। এই সালে ঠাকুরদাসের একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহার নাম রাখা হইল মাতঙ্গিনী। ঠাকুরদাস আদর করিয়া তাহাকে 'মাতু' বলিয়া ডাকিতেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বামীকে হারাইলেন। অতঃপর তিনি দেশের মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক হইলেন। তখন হইতেই তিনি দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩২ সনের ২৬শে জানুয়ারী জাতীয় পতাকা হাতে ইংরেজ-বিরোধী এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। ইংরেজদের চোখে দেশমাতাকে ভালবাসা ছিল এক অমার্জনীয় অপরাধ। সেই অপরাধে অপরাধী হইলেন তিনি। তাই তাঁহাকে হাজত বাস করিতে হইল। দেশবাসী তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। তাই তাহারা আদর করিয়া তাঁহার নাম দিয়াছিল 'গান্ধী বুড়ি'।

১৯৪২ সনের আগস্ট মাস। ইহা ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে স্মরণীয় কাল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ

করিলেন। এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ইহাতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। বাঙলা দেশের উপর জাপানী আক্রমণ আসন্ন। ইংরেজরা তাই নৌকা, সাইকেল আটক করিতেছে। সৈন্যদের খাদ্যের জন্য দূরে সরাইয়া দিতেছে ধান-চাল। এইভাবে ধান-চাল সরাইবার সময় মেদিনীপুর বাসীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটিল। গুলি চলিল। প্রতিবাদে মেদিনীপুরে হরতাল ঘোষিত হইল। মেদিনীপুর বাসীরা সেইখানেই থামিলেন না তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে সরকারী থানা, ডাকঘর, রেলস্টেশন পোড়াইতে লাগিলেন। রেললাইন তুলিয়া ট্রেন-চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইংরেজও বালক, বৃদ্ধ, নারী—কোনো কিছুর বিচার না করিয়া সকলের উপরেই চালাইতে লাগিল লাঠি, গুলি, বেয়নেট। তাহারা লোকের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিল, বাস্তুভিটা লাঙ্গল দিয়া চষিয়া সমভূমি করিল এবং লোকজনদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিল।

ইহারই মধ্যে একদিন মেদিনীপুরের তমলুকে বিপ্লবীদের এক বিরাট মিছিল বাহির হইল। মিছিলটিতে সমবেত বহু নারী পুরুষ।

সরকারী পুলিস আর সৈন্য আসিয়া শোভাযাত্রীদের বাধা দিল। তাহাদের হাত হইতে জাতীয় পতাকা ফেলিয়া দিতে আদেশ দিল।

এত বড় স্পর্ধার কথা? জাতীয় পতাকা হাত হইতে ফেলিয়া দিতে হইবে? মুহূর্তের মধ্যে সেই মিছিলের ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিলেন মেদিনীপুরবাসিনী তিয়াত্তর বছরের এক বৃদ্ধা রমণী। তাঁহার নাম মাতঙ্গিনী হাজরা। হাতে তাঁহার ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা। তিনি বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া বলিলেন "কখনও না, মিছিল আমরা বন্ধ কিছুতেই করিব না, প্রাণ থাকিতে হাত হইতে জাতীয় পতাকাও নামাইব না।" তারপর তিনি শোভাযাত্রীদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা নির্ভয়ে সকলে আগাইয়া চল। বল, বন্দেমাতরম্।"

সহস্র কণ্ঠ গর্জন করিয়া উঠিল, "বন্দেমাতরম্।" সেইসঙ্গে সরকারী সৈন্যদের বন্দুকও। দুইটি গুলি আসিয়া লাগিল মাতঙ্গিনীর হাতে।

তবু তিনি অন্য হাতে পতাকা ধরিয়া আগাইয়া চলিলেন। আশ-পাশে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলিতেছে। গুলিতে আহত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছেন বহু শোভাযাত্রী। মাতঙ্গিনীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন তিয়াত্তর বছরের সেই বৃদ্ধা, হাতে তাঁহার বজ্রমুষ্টিতে ধরা জাতীয় পতাকা, মনে তাঁহার অসীম বল।

হঠাৎ একটি গুলি আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কিন্তু জাতীয় পতাকাটি তখন তাঁহার হাতে উঁচু করিয়া ধরা।

আজ স্বাধীন ভারতের আকাশে গর্বভরে উড়িতেছে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। সেই পতাকার সঙ্গে দুলিতেছে বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরার সেদিনকার অমূল্য আত্মদানের কাহিনী। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর শহীদ এই মাতঙ্গিনী হাজরা।

এই বীর রমণী আজ আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু দেশবাসী তাঁহাকে চির দিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

অনুশীলনী

১। মাতঙ্গিনী হাজরা কে? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁহার পিতার নাম কি?

২। মাতঙ্গিনী হাজরা কাহাদের গুলিতে নিহত হন?

৩। তাঁহাকে 'শহীদ' বলা হয় কেন?

৪। মাতঙ্গিনী হাজরার বীরত্বব্যঞ্জক কাজ সম্বন্ধে কি জান?

৫। মাতঙ্গিনীকে কেন দেশবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে?

৬। নীচের সঠিক বাক্যটির পাশে ✓ চিহ্ন দাও :—

(i) মাতঙ্গিনী হাজরা জন্মগ্রহণ করেন মেদিনীপুরে / বাঁকুড়ায়।

(ii) মাতঙ্গিনী হাজরা মারা যান পুলিশের গুলিতে / অসুখে।

বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন



বাঘা যতীন ছিলেন বিপ্লবী বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁহার সংগঠন শক্তি ছিল অসাধারণ। এই পুরুষ-সিংহের আসল নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি যৌবনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একটি বাঘ হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় 'বাঘা যতীন'।

নদীয়া জেলায় নয়াগ্রামে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'আনন্দমঠ' হইতে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিবার প্রেরণা লাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দের সময় তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন এবং তরুণদের সংগঠিত করিয়া বিপ্লবী সংগ্রামকে শক্তিশালী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তখন হইতে তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল কিভাবে অত্যাচারী ইংরেজদের এইদেশ হইতে তাড়ানো যায়।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পর যতীন্দ্রনাথের উপর বিপ্লবীদের নেতৃত্বের ভার পড়িল।

এই সময় বাংলার বিপ্লবের এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজরা জার্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, শত্রুর এই দুর্বল মুহূর্তে বিপ্লবীরা আঘাত হানিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে বিদেশ হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করিতে না পারিলে তাঁহাদের আন্দোলন শক্তিশালী করা সম্ভব হইবে না। তাই তাঁহারা গোপনে জার্মান সরকারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। জার্মান সরকার তাহার শত্রু ইংরেজদের দুর্বল করিবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র দিতে সম্মত হইলেন।

অতঃপর ঠিক হইল এক-জাহাজ অস্ত্র জার্মানী হইতে উড়িষ্যার বালেশ্বরে আসিবে। কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী সেই জাহাজ হইতে অস্ত্র লইয়া সারা ভারতের বিপ্লবীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ চারিজন বিপ্লবীকে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যার বালেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সঙ্গীদের লইয়া বালেশ্বর হইতে কুড়ি মাইল দূরে কাপ্তিপোদা নামক স্থানে আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার সঙ্গী চারিজন ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্র দাসগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল।

বিপ্লবীদের মধ্যে তখন কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। তাহারা আশু সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা বিরূপ। বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করিল কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক। তাহারা ষড়যন্ত্রের কথা পুলিসের নিকট ফাঁস করিয়া দিল। পুলিস সাংহাই বন্দরে জার্মান জাহাজ আটক করিল।

পুলিস যতীন্দ্রনাথ ও অন্য চারিজন বিপ্লবীর অজ্ঞাতবাসের কথাও জানিতে পারিল। তাহারা অনতিবিলম্বে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে কাপ্তিপোদায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

যতীন্দ্রনাথ দেখিলেন তখন আর পালাইবার উপায় নাই। তাই তিনি স্থির করিলেন পুলিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বীরের মৃত্যু বরণ করিবেন। তিনি তখন বুড়ীবালাম নদীর তীরে একটি উপযুক্ত স্থানে পরিখা খনন করিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তিনি তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহার নাই, নিদ্রা নাই। তাঁহারা নির্ভীক হৃদয়ে বজ্রমুষ্টিতে পিস্তল ও রাইফেল ধারন করিয়া শত্রুদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দেখা গেল অদূরে পুলিসবাহিনী। পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট তাহাদের দলপতি। তিনি বিপ্লবীদের বলিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর'। যতীন্দ্রনাথ বলিলেন কাপুরুষের ন্যায় আত্মসমর্পণ করা বিপ্লবীদের ধর্ম নয়। তিনি

তখন টেগার্ট সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। অনতিবিলম্বে পুলিসের সবগুলি বন্দুক গর্জন করিয়া উঠিল। বিপ্লবীরা যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে অসীম সাহসের সহিত পুলিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গুলি বর্ষণে পুলিসদের কয়েকজন ধরাশায়ী হইল। বিপ্লবীদের অসামান্য সাহস দেখিয়া টেগার্ট আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া দুই পক্ষের গুলি বিনিময় চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুর গুলির আঘাতে চিত্তপ্রিয় নিহত হইলেন। এদিকে চিত্তপ্রিয়কে একটু সরাইয়া না দিলেও যুদ্ধ করা কঠিন। কারণ পরিখা ছিল খুবই সংকীর্ণ। যতীন্দ্রনাথ যেমনি তাহাকে সরাইতে যাইবেন তখনই একটি গুলি আসিয়া তাঁহার পেটে লাগিল। তিনি তখন বাঁ হাতে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে গুলি চালাইতে লাগিলেন। তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হইলেন, অবশিষ্ট বিপ্লবীরা তখন শত্রুদের বিরুদ্ধে দুর্বার আক্রমণ চালাইলেন। সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা যুদ্ধ চলিল। তাঁহাদের সঙ্গে যে গুলি ছিল উহা ফুরাইয়া গেল। মৃত্যুপথ-যাত্রী নেতা যতীন্দ্রনাথ তিনটি নিষ্পাপ ফুলের ন্যায় পবিত্র কিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি যুদ্ধের রীতি অনুসারে একটি সাদা রুমাল উড়াইলেন।

টেগার্ট সাহেব তখন তাহার পুলিসদের ডাকিয়া যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীদের পরিখা হইতে আনিবার আদেশ দিলেন। তারপর তাঁহাদের নিকটবর্তী বালেশ্বর হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন এবং মৃতব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন।

পরের দিন যতীন্দ্রনাথ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। টেগার্ট সাহেব সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহার মাথা হইতে টুপি খুলিয়া মৃত বিপ্লবীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিলেন, "আমি অকপটে স্বীকার করছি যতীন্দ্রনাথ সত্যিই একজন দেশপ্রেমিক। আমার যতদূর জানা আছে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালা যিনি পরিখা যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিলেন।"

যতীন্দ্রনাথ সত্যই বীর ছিলেন। কিশোর বয়সে যিনি বাঘের সহিত

সংগ্রাম করিয়া 'বাঘা যতীন' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, যৌবনে তিনি ব্রিটিশ-সিংহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন করিয়া শহীদ হইলেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের জন্য ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন।

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় বুড়ী বালামের তীরে বিপ্লবী সংগ্রামীদের উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটির রচনা করিয়াছিলেন।

"বুড়ী বালামের তীরে
বুকের শোণিতে যেদিন তোমরা রাঙ্গালে ধরিত্রীরে,
সম্মুখ রণে যুঝি প্রাণপণে ঘুমালো বীরের দল—
মৃত্যু সেদিন জ্বালাল শ্মশানে মুক্তির হোমানল।"

অনুশীলনী

১। 'বাঘা যতীন' কাহাকে বলা হইত? তাঁহাকে 'বাঘা যতীন' বলা হইত কেন? তাঁহার জন্ম হয় কোথায়?

২। বিপ্লবীদল কোথা হইতে, কিভাবে অস্ত্র আমদানি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন?

৩। বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র কিভাবে ফাঁস হইয়া গিয়াছিল? কাহারা ফাঁস করিয়াছল? ইহার পরিণতি কি হইয়াছিল?

৪। বিপ্লবীদের নায়ক কে ছিলেন? তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন?

৫। টেগার্ট সাহেব কে ছিলেন? তিনি বিরাট পুলিসবাহিনী লইয়া কোথায় গিয়াছিলেন এবং কেন?

৬। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় বুড়ী বালামের তীরে বিপ্লবী সংগ্রামীদের উদ্দেশ্য করিয়া যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন উহা বল।

৭। বীর নেতা যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পুলিসের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল উহার বর্ণনা দাও।

৮। যতীন্দ্রনাথ কোথায় মারা যান?

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী



ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য যেই সব বাঙালী সন্তান আজীবন সংগ্রাম করিয়া চির-স্মরণীয় হইয়াছেন রাসবিহারী বসু তাঁহাদের অন্যতম।

১৮৮৫ সনের ২৫শে মে বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিনোদবিহারী বসু। তিনি কর্মোপলক্ষে চন্দন নগরে বাস করিতেন। এখানেই রাসবিহারীর লেখাপড়া আরম্ভ হয়। কালক্রমে তিনি গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন।

এই গুপ্ত সমিতির সহিত কলিকাতা মানিকতলার মুরারি পুকুরের গুপ্ত সমিতির নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ঐ সময়ে বোমার মামলার ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছিল এবং গুপ্ত সমিতির নিকট রাসবিহারীর লেখা দুইটি চিঠি পুলিসের হস্তগত হওয়ায় রাসবিহারী গ্রেপ্তার হন। কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান। মুক্তি পাইয়া রাসবিহারী দেরাদুন চলিয়া যান এবং সেখানে সরকারী অফিসে চাকুরী পান। কিছুদিন পর তিনি গোপনে বাঙলার ন্যায় উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তোলেন।

সেই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলিতেছিল। ইংরেজরা বাংলা-দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিল এবং ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া উৎসবের আয়োজন করিল। সেই উৎসবের একটি অঙ্গ ছিল শোভাযাত্রা। স্থির হইল বড়লাট হার্ডিঞ্জ হাতীতে

চড়িয়া জনতার নিকট দেখা দিবেন এবং জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন।

বাঙলার বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ঐ শোভাযাত্রার মিছিলে বড়লাটকে আঘাত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে দিল্লীও নিরাপদ স্থান নয় এবং বিপ্লবীরা সমস্ত ভারত জুড়িয়া ছড়াইয়া আছে এদেশ ইংরেজদের নিকট আর নিরাপদ নয়। হার্ডিঞ্জকে হত্যা করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল বসন্ত বিশ্বাস নামে বাংলার এক বিপ্লবীযুবককে। যুবক বসন্ত বিশ্বাস শোভাযাত্রার সময় হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া বোমা ছুঁড়িয়া মারিলেন। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় হার্ডিঞ্জ সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেন, মারা গেল তার আর্দালি। ইহাতে শোভাযাত্রা ভাঙিয়া গেল কিন্তু বসন্ত বিশ্বাসকে কেহ খুঁজিয়া পাইলনা। ঘটনার পরে বিপ্লবীদের মনোবল আরও বাড়িয়া গেল এবং রাসবিহারীর প্রতি তাঁহাদের আস্থা আরও দৃঢ় হইল। রাসবিহারী পরবর্তী আক্রমণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বিপ্লবীরা সংবাদ পাইল ১৯১৩ সনের ১৭ই মে লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে ইংরেজদের এক সম্মেলন হইবে। বিপ্লবীরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাহারা ঐ সম্মেলন স্থলের নিকট এক জঞ্জাল স্তূপের ভিতর শক্তিশালী বোমা রাখিবার পরিকল্পনা করিলেন। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইল বসন্ত বিশ্বাসের উপর। তিনি পরিকল্পনা মত বোমাটি জঞ্জালের স্তূপের ভিতর রাখিয়া আড়ালে লুকাইয়া রহিলেন।

এবারেও বিপ্লবীদের ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিল। এক মেথর সেখানে জঞ্জাল দেখিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য যেই হাত দিল সঙ্গে-সঙ্গে বোমাটি ফাটিয়া গেল এবং ইহাতে সে মারা গেল। এদিকে আড়ালে লুকাইয়া থাকা বসন্ত কৌতূহলী হইয়া ঘটনা কি ঘটিল তাহা দেখিবার জন্য ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইল, সেখানে সন্দেহজনক ভাবে একটি বাঙালী যুবককে দেখিয়া পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ক্রমে-

ক্রমে পুলিস বিপ্লবী আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ ও অবোধ বিহারীকে গ্রেপ্তার করিল, কিন্তু রাসবিহারী পুলিসের হাতে ধরা দিলেন না। ইংরেজ সরকার তখন রাসবিহারীর মাথার দাম ধার্য করিয়া ইস্তাহার দিলেন।

এই সময়ে রাসবিহারী ও তাঁর সহযোগী বিপ্লবীরা স্থির করিলেন ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে এবং বিদেশ হইতে অস্ত্র আনিয়া প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে।

সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। ব্রিটিশদের প্রবল শত্রু তখন জার্মানী। স্থির হইল জার্মানী অস্ত্র দিয়া বিপ্লবীদের সাহায্য করিবে।

সব যখন প্রস্তুত ঠিক সেই সময় দলের ভিতরের কোন বিশ্বাস-ঘাতক কর্তৃক গোপন তথ্য ফাঁস করিয়া দেওয়ায় বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল। বড়-বড় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইল। কিন্তু পুলিস রাসবিহারীর কোন সন্ধান করিতে পারিল না।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ জাপান ভ্রমণে যাইবেন ঠিক হইল। রাসবিহারী পি. এন. ঠাকুরের ছদ্মবেশে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী সাজিয়া ব্রিটিশের চোখে ধূলা দিয়া জাপান চলিয়া গেলেন। রাসবিহারী কিন্তু প্রাণের ভয়ে বিদেশে যান নাই। তিনি যাহাতে ব্রিটিশের হাতে ধরা না পড়েন এবং বিদেশে থাকিয়া স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতে পারেন, সেই জন্যই বিদেশ গিয়াছিলেন। তিনি অতঃপর বিদেশে থাকিয়া স্বদেশকে মুক্ত করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্রথম "আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ" গড়িয়া তোলেন। পরে সুভাষচন্দ্র জাপান গেলে তাঁহার নিকট ঐ বাহিনীর ভার সমর্পণ করেন। ১৯৪৫ সনের জানুয়ারী মাসে জাপানেই এই বিপ্লবী বীর মৃত্যু বরণ করেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁহার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

১। রাসবিহারী কোথায় এবং কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কি ?

২। রাসবিহারী চাকুরী নিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন ? সেখানে তিনি কিভাবে ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত হানেন ?

৩। রাসবিহারীর কোন্ কোন্ পরিকল্পনায় বসন্ত বিশ্বাস অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

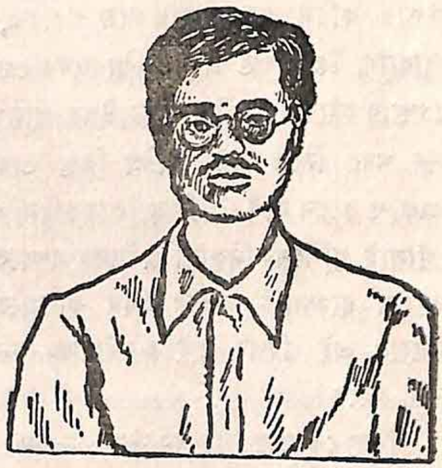
৪। রাসবিহারী কিভাবে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিলেন ? কেন এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় ?

৫। কি ভাবে রাসবিহারী বিদেশে পলায়ন করেন ?

৬। বিদেশে যাইয়া রাসবিহারী কিভাবে স্বদেশের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ?

৭। রাসবিহারীর-জন্ম হয় কোথায় ? তাঁহার পিতার নাম কি ?

মৃত্যুঞ্জয়ী বীর কানাইলাল



ভারতকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে-সব বিপ্লবী অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন কানাইলাল তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার চন্দননগরে কানাই-লালের জন্ম হয়। বোম্বাইতে তাঁহার বাল্যকাল অতি-বাহিত হয়। তিনি পরে চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজের নামকরা অধ্যাপক ছিলেন চারুচন্দ্র রায়। চারুচন্দ্র ছিলেন মনেপ্রাণে বিপ্লবী। তিনি কয়েকজন ছাত্রকে গোপনে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কানাইলাল ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মুষ্টিযুদ্ধ, অস্ত্র চালনা ও বন্দুক ছোঁড়াতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পারদর্শী।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। কিছুদিন পর দলের নির্দেশে তিনি চট্টগ্রামে যান। সেখানে কুলিসাজিয়া কুলিদের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করেন এবং তাহাদের লইয়া সেখানে এক গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তোলেন।

এই সময় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হইল। নেতারা বিলাতি জিনিস বর্জন করিলেন এবং সকলকে উহা কিনিতে ও ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। বিপ্লবী কর্মীদলের সহিত কানাইলালও এই কাজে যোগদান করিলেন। এই সময়ে অরবিন্দ কলিকাতা আসিয়া

মুরারি পুকুরে বোমার কারখানা তৈরী করিলেন। কানাইলালও সেখানে যোগ দিলেন।

পুলিস খবর পাইয়া ১৯০৮ সনের ২রা মে হঠাৎ মুরারি পুকুরের আস্তানা ঘেরাও করিল। তাহারা অনেকগুলি বোমা ও বন্দুকের গুলি উদ্ধার করিল আর তাহার সঙ্গে অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাস দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিল। কানাইলালও গ্রেপ্তার হইলেন। বিপ্লবীদের উপর পুলিস অকথ্য অত্যাচার করিয়া সব খবর নিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহারা, কেহই একটিও গুপ্ত খবর প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কয়েকদিন পরে জানা গেল যে নরেন গোঁসাই পুলিশের নিকট বিপ্লবীদের সম্পর্কে অনেক গোপন খবর প্রকাশ করিয়া রাজসাক্ষী হইবে স্থির করিয়াছে। বিপ্লবীরা স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন এই বিপদ হইতে বাঁচার জন্য নরেন গোঁসাইকে হত্যা করা হইবে।

কিন্তু কোথায় পাইবেন তাঁরা নরেন গোঁসাইকে? সতর্ক পুলিস তাহাকে আগেই সরাইয়া দিয়াছিল জেল হাসপাতালের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে। বিপ্লবীদের নিকট অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। নরেন গোঁসাইকে হত্যা করিবার সব দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

কানাইলাল পিস্তল সংগ্রহ করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতার ভান করিয়া হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। তিনি পুলিসকে বলিলেন যে তিনিও রাজসাক্ষী হইবেন স্থির করিয়াছেন। তবে উহার পূর্বে নরেন গোঁসাইয়ের সঙ্গে তাঁহার গোপন পরামর্শের দরকার। পুলিস খুব খুশী হইয়া এ ব্যাপারে সম্মত হইল। ইতিমধ্যে কানাইলাল ও চলিয়া আসিলেন হাসপাতালে। ১৯০৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর নরেন গোঁসাইকে আনা হইল সত্যেন্দ্রনাথের নিকট। বিছানায় বসিয়া দুইজনে কথা বলিতেছেন, বারান্দায় পুলিস পাহাড়া দিতেছে। সিঁড়ির নিকট দাঁত মাজিবার অছিলায় কানাইলাল দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাই সংকেত যে, কানাইলালও প্রস্তুত। দুই একটা কথা বলার পরই

সত্যেন্দ্র নাথের হাতের পিস্তল গর্জিয়া উঠিল। ঠিকমত গুলিটি লাগিল না। নরেন পালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এদিকে কানাইলালও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নরেনের পিছনে তাড়া করিয়া জেল-প্রাঙ্গণে নরেন গোঁসাইকে গুলি করিলেন। গুলি লাগায় নরেন গোঁসাই মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। বোমার মামলার সঙ্গে তাঁহাদের নামে আরও একটি মামলা রুজু করা হইল। মামলাটির নাম 'নরেন গোঁসাই হত্যা মামলা'। কানাইলাল এই মামলার সব দায়িত্ব নিজের উপর তুলিয়া লইলেন। তিনি নিজের জন্য কোন আইনজীবী নিলেন না। তিনি বিচারকের নিকট বলিলেন তাঁহার গুলিতেই নরেন নিহত হইয়াছে। বিচারক তাঁহার ফাঁসির হুকুম দিলেন। ১৯০৮ সনের ১০ই নভেম্বর ফাঁসির দিন তিনি হাসিমুখেই ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত হইলেন। ফাঁসির সময় তাঁহার নির্ভীক প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষ বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। কানাইলাল ফাঁসির পূর্বে বলিয়াছিলেন, "আমি বল্‌ছি, ইংরেজদের এদেশ থেকে চলে যেতেই হবে। মৃত্যু ও আমাদের ঠেকাতে পারবে না। আমরা বার-বার ফিরে আসব। বন্দেমাতরম্"।

তাঁহার মৃতদেহ নিয়া কলিকাতায় সেদিন বিরাট শোক মিছিল বাহির হইয়াছিল। সেদিন সকলেই শোকে জাতিভেদ ভুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার শবদেহের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে হাজার-হাজার মানুষ ছুটিয়া আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই। যতদিন বাঙলা থাকিবে, বাঙালী থাকিবে, ততদিন কানাইলাল অমর হইয়া থাকিবেন।

অনুশীলনী

১। কানাইলাল কোন্ সনের কত তারিখে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। কানাইলাল কোথায় কোথায় পড়াশুনা করেন? তাঁহাকে রাজনীতিতে কে নিয়া আসেন?

৩। কানাইলালকে চট্টগ্রামে কি উদ্দেশ্যে পাঠানো হইয়াছিল ?

৪। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি কিভাবে অংশগ্রহণ করেন ?

৫। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ কেন নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন ?

৬। কাহারা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছিলেন ?

৭। কানাইলালের ফাঁস কবে হইয়াছিল ? ফাঁসির পূর্বে তিনি কি বলিয়াছিলেন ?

ফাঁসির মঞ্চে প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম



একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।

অজ্ঞাত লোককবির রচিত এই গান আজ এতদিন পরেও আমাদের প্রাণের তারে ঝংকার তোলে। যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই গানটি রচিত তিনিই অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরামের জন্ম-তারিখ ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর (বাংলা ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৬)। কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান সম্পর্কে একটা ভুল খবরই এতদিন আমাদের জানা ছিল যে, তিনি জন্মিয়াছিলেন মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার মোহবনী গ্রামে। কিন্তু এই ভুলের নিরসন হইয়াছে তাঁহার জন্মস্থানে তাঁহার একটি মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে। এই সম্পর্কে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের একটি প্রতিবেদন আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মস্থান মেদিনীপুরের হাবিবপুরে আগামী ১১ই আগস্ট ক্ষুদিরামের একটি আবক্ষ মূর্তি উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল। ১৯০৮ সনের ১১ই আগস্ট ১৯ বছর বয়সে মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। মেদিনীপুরের জেলাশাসক, ল্যাণ্ড রেকরড্‌স্‌ বিভাগের পদস্থ অফিসারদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এতদিন পর বিপ্লবীর সঠিক জন্মস্থানের হদিস মিলেছে। ক্ষুদিরামের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে জীবিত তাঁর বৃদ্ধা দিদি ভীমা দেবী জায়গাটি সনাক্ত করেছেন। ওই স্থানটি হল মেদিনীপুর শহরে হাবিবপুরের কাছে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের বিপরীত দিকে। বর্তমানে সেখানে রয়েছে একটি ক্লাব।"

ক্ষুদিরামের বাবার নাম ত্রৈলোক্যনাথ বসু। মায়ের নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। ক্ষুদিরামের বড় তিন বোন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা হলেন অপরূপা দেবী। ক্ষুদিরামের পূর্বে আরো দুইভাই জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই মারা যান। তাই লৌকিক সংস্কার অনুযায়ী মৃত্যুকে ফাঁকি দিবার জন্য অপরূপা দেবী তাঁহার মার নিকট হইতে ছোট ভাইটিকে কিনিয়া নেন তিন মুঠা ক্ষুদ দিয়া। এই জন্যই তাঁহার নাম হয় 'ক্ষুদিরাম'।

ক্ষুদিরামের ছেলেবেলাতেই তাঁহার মা-বাবা মারা যান। তখন হইতে তিনি বিবাহিত বড়দির অর্থাৎ অপরূপা দেবীর সংসারেই মানুষ হইতে থাকেন।

ক্ষুদিরাম যখন মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন, তখনই সেখানকার শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন বিপ্লবী, ক্ষুদিরামকেও তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন বিপ্লবীমন্ত্রে। তাই ছেলেবেলা হইতেই তিনি বেপোরোয়া দুঃসাহসী। তখনকার একটি দিনের কথা বলিতেছি।

১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে এক শিল্প-প্রদর্শনী হয়। সত্যেন বসুর নির্দেশে ক্ষুদিরাম সেই প্রদর্শনীর গেটের কাছে দাঁড়াইয়া 'সোনার বাংলা' নামে একটি নিষিদ্ধ পুস্তিকার বেশ কিছু কপি বিতরণ করিতে থাকেন। হঠাৎ একজন পুলিস তাঁহাকে গ্রেফতার করে। ডানপিটে

ছেলে ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে কয়েকটা ঘুষি বসাইয়া দেয়। ঠিক সেই সময়ে সত্যেন বসু সেখানে হাজির হইয়া পুলিসটিকে বলেন, ছেলেটি ডেপুটি সাহেবের ছেলে। একথা শুনিয়া পুলিসটি ক্ষুদিরামকে ছাড়িয়া দিতেই ক্ষুদিরামও নিমেষে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। পরে অবশ্য তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ-মূলক মামলাও আনা হয়। কিন্তু কিছুদিন মামলা চালাইবার পর উহা প্রত্যাহারও করিয়া নেওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইলে বিলাতী কাপড় পোড়ানো, বিলাতী নুনের দোকান পোড়ানো ইত্যাদি কাজে তিনি মাতিয়া যান। কিন্তু তাঁর তখনকার সবচেয়ে বড় চমকপ্রদ কাজ হইল বিপ্লবীদের হইয়া স্বদেশী ডাকাতি করিয়া অর্থসংগ্রহ করা। ১৯০৭ সালে কালীপূজার সময় একবার তিনি ডাকহরকরার মেলব্যাগ ছিনিয়া নেন। এই ঘটনাতেই তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়ে বিপ্লবী নেতাদের।

বাঙলার বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত করিলেন কুখ্যাত শাসক কিংস ফোর্ডকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া দিতেই হইবে। এই-ভার দেওয়া হইল দু'জন তরুণ বিপ্লবীর উপর। একজন হইলেন রংপুরের প্রফুল্ল চাকী আর-একজন মেদিনীপুরের ক্ষুদিরামবসু। যাইবার পূর্বে তাহাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল বোমা ও তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র। আদেশ—বোমা ব্যর্থ হইলে পিস্তল ব্যবহার করিতে হইবে।

১৯০৮ সাল এপ্রিল মাসে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দুইজনে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন মজঃফরপুরের দিকে। যাইবার পূর্বে ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন দুইজনে—ক্ষুদিরামের নাম হইল হরেন সরকার (কাহারো কাহারো মতে দুর্গাপ্রসাদ সেন), আর প্রফুল্ল চাকীর নাম হইল দীনেশ রায়। ইহা মন্ত্রগুপ্তির ব্যাপার।

মজঃফরপুরে পৌঁছাইয়া তাঁহারা উঠিলেন এক ধর্মশালায়। সেখান হইতে কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কিংসফোর্ড রোজ রাত আটটার সময় ইউরোপীয়ান ক্লাব হইতে নিজের ফিটন গাড়িতে চড়িয়া বাড়ি ফিরেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন, ঐ সময়েই একদিন রাত্রির অন্ধকারে কাজ হাসিল করিতে হইবে।

সেদিন ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল।

রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে ইউরোপীয়ান ক্লাবেরই কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ওতপাতিয়া আছেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল। চোখে তাঁহাদের জ্বলন্ত হিংসা, ঘৃণা আর ক্রোধ! মনে তাঁহাদের লৌহদৃঢ় প্রত্যয়। হঠাৎ—

ঐ যে একটা ফিটন গাড়ি আসিতেছে। আরো কাছে—আরো কাছে—একেবারে নাগালের মধ্যে।

বুম্-ম্-ম্-ম্!

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কাঁপিয়া উঠিল সারা শহর। এক ঝলক আলো। তারপর শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

কিন্তু না, লক্ষ্য ফস্‌কিয়া গিয়াছে। গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন ব্যারিস্টার মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা—মিসেস ও মিস কেনেডি। তাঁহারাই মারা গেলেন বোমার আঘাতে।

সে যাই হোক, বোমা নিক্ষেপের পরেই তাঁহারা দুইজন তীরবেগে পালাইতে লাগিলেন। খানিক দূরে যাইয়াই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দুইজনে দুইটি ভিন্ন পথ ধরিলেন।

ইতিমধ্যে বোমা ছোড়ার কথা পুলিসের মাধ্যমে ছড়াইয়া পড়িল। স্টেশনে-স্টেশনে, থানায়-থানায় খালি পায়ের তরুণ কাহাকেও দেখিলেই গ্রেফতার করো। আততায়ীরা ঘটনাস্থলেই জুতা ফেলিয়া পালাইয়াছে। পুলিসের ছোট-বড় অফিসার, কনস্টেবল সবাই দিকে-দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সন্দেহজনক কাহাকেও দেখিতে পাইলেই ধরিতে হইবে।

সারারাত্রি ধরিয়া চব্বিশ মাইল একটানা ছুটিয়া ভোরের দিকে ক্ষুদিরাম আসিয়া হাজির হইলেন ওয়াইনি রেল-স্টেশনের কাছে। পরিশ্রমে তাঁহার সারা দেহ তখন ক্লান্ত। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় তাঁহার সর্বাঙ্গ অবশ। প্রাণ তখন চাইছে কিছু খাদ্য আর জল।

হঠাৎ চোখে পড়িল, স্টেশনের কাছেই রহিয়াছে একটা মুদীর দোকান। আশায় ভরিয়া উঠিল তাঁহার মন। নিশ্চয়ই খাবার মিলিবে সেইখানে। পা দুইটিকে টানিয়া-টানিয়া হাজির হইলেন সেই দোকানে।

খানিক দূরেই দাঁড়াইয়াছিল দুইজন কনস্টেবল। ফতে সিং আর শিবপ্রসাদ মিশির। তাহাদের চোখ পড়িল ক্ষুদিরামের দিকে। চুল উষ্কখুষ্ক, সারা গায়ে ধুলাবালি, মুখেচোখে ক্লান্তির ছাপ। কে এই ছেলেটি? ছেলে নয় তো কী? কত আর বয়স হইবে? বড় জোর সতেরো কি আঠারো।

সন্দেহ জাগিল তাহাদের মনে। তাহারা তাড়াতাড়ি ক্ষুদিরামের দিকে অগ্রসর হইল।

হঠাৎ পুলিসের লোক আসিতে দেখিয়াই কোমরে হাত দিলেন ক্ষুদিরাম। সেখানে রিভলবার রহিয়াছে। কিন্তু উহা বাহির করিবার আগেই কনস্টেবল দুইজন তাঁহাকে সবলে জাপটাইয়া ধরিল। তাঁহাকে তল্লাশি করিয়া পাওয়া গেল আরো একটি রিভলবার আর কিছু কার্তুজ। গ্রেপ্তার হইলেন ক্ষুদিরাম। সেদিন ১৯০৮ সালের ১লা মে।

স্পেশাল ট্রেনে করিয়া ক্ষুদিরামকে নিয়া আসা হইল মজঃফরপুরে। স্টেশন তখন লোকে লোকারণ্য। সবাই বীর বিপ্লবীকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ট্রেন হইতে নামিয়া সেই উৎসুক জনতার দিকে তাকাইয়া ক্ষুদিরাম উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—'বন্দে মাতরম্'! তারপর দৃঢ়-পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন তাঁহার জন্য স্টেশনের বাইরে-রাখা ফিটন গাড়ির দিকে।

অতঃপর বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইল। তিনি বীরের ন্যায় হাসিতে হাসিতে ফাঁসির কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিলেন। তিনি হইলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে ফাঁসির মঞ্চে প্রথম শহীদ।

সেদিন অজ্ঞাত লোককবি যে-গান বাঁধিয়াছিলেন উহার শেষের দিকে আছে :

"দশমাস দশদিন পরে
ক্ষুদিরাম তোর আসবে ফিরে, (মাগো)
(তখন) চিনতে যদি না পারো মা গো।
দেখবে গলায় ফাঁসি ॥"

ক্ষুদিরাম কি আবার আসিয়াছিলেন? নিশ্চয়ই। ক্ষুদিরাম তো

একটি বিশেষ তরুণ নন! দেশের জন্য নির্ভয়ে যিনি মৃত্যুবরণ করিতে পারেন, তিনিই ক্ষুদিরাম। দেশে দেশে যুগে যুগে যাঁহারা এইভাবে প্রাণ দিয়াছেন, প্রাণ দিতেছেন, প্রাণ দিবেন—তাঁহারাই ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরাম তাই মৃত্যুহীন প্রাণ!

অনুশীলনী

১। স্বাধীনতা সংগ্রামে ফাঁসির মঞ্চে প্রথম শহীদ কে?

২। ক্ষুদিরামকে কে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেন?

৩। 'ক্ষুদিরাম' নাম রাখা হইয়াছিল কেন?

৪। কিংসফোর্ড কে ছিলেন? ক্ষুদিরাম কেন তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন?

৫। ক্ষুদিরামকে কেন মৃত্যুহীন প্রাণ বলা হইয়াছে?

৬। ক্ষুদিরামের জন্ম কোথায় হইয়াছিল? তাঁহার বাবার নাম কি? তাঁহার মায়ের নাম কি?

৭। ডানদিকের বন্ধনীর ভিতর হইতে সঠিক শব্দটি দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর:—

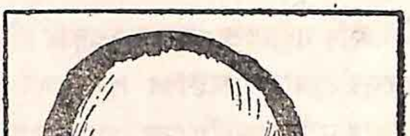
(i) ——সনে ক্ষুদিরামের জন্ম হয়। (১৮৯৮/১৮৮৯)

(ii) ——ক্ষুদিরামকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। (সত্যেন্দ্রনাথ/যতীন্দ্রনাথ)

(iii) ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন——রেল স্টেশনে। (ওয়াইনি/মজঃফরপুর)

———

বিপ্লবের মহানায়ক সূর্য সেন



সূর্য সেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে এক অবিস্মরণীয় নাম। সূর্যের মতোই প্রদীপ্তভাস্বর। সূর্যের মতোই একক ও অনন্য।

তাঁহার আর-এক নাম 'মাস্টার দা'। এই নামেই তিনি সবচেয়ে বেশী পরিচিত, বিশেষ করিয়া বিপ্লবীদের কাছে।

'মাস্টার-দা' নাম হইবারও একটা কারণ আছে। তিনি মাস্টারি করিতেন চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাইস্কুলে। শিক্ষকতার কাজ তিনি ইচ্ছা করিয়াই বাছিয়া নিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন জন্মবিপ্লবী। তাঁহার রক্তের মধ্যে ছিল বিপ্লব। তিনি চাহিয়াছিলেন কিশোর-তরুণদের বিপ্লবী আদর্শে গড়িয়া তুলিতে।

কেবল সূর্য সেনই নন, বাঙলার বহু বিপ্লবীই ছিলেন শিক্ষক। অরবিন্দ ছিলেন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যাপক। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছেন শিক্ষকতা। ক্ষুদিরামের বিপ্লবী গুরু সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। কানাইলাল যাঁহার কাছে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই চারুচন্দ্র রায় অধ্যাপনা করিতেন চন্দননগর ডুপ্লে কলেজে। শিক্ষকরাই তো প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারেন ছেলেদের সঙ্গে। আর ছেলেরাই তো ভবিষ্যতের বিপ্লবী। শিক্ষকরা যেভাবে গড়িয়া তুলিবেন ছেলেদের, সেইভাবেই গড়িয়া উঠিবে

তাহারা। জাতি গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকদের দায়িত্ব তাই অনেক বেশী। বাঙলার বিপ্লববাদে, স্বাধীনতার ইতিহাসে, শিক্ষকদের রহিয়াছে গৌরবময় ভূমিকা।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্মভূমি চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামেই ১৮৯৩ সালের ২৫শে অক্টোবর সূর্য সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাজমণি সেন, মায়ের নাম শশীবালা দেবী।

সূর্য সেনের দেহরূপে বিশেষ জলুস ছিল না। বাহির হইতে তিনি অতি সাধারণ। শীর্ণ চেহারার মানুষ। তাঁর কোন ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়াই বোঝা যাইত না। কিন্তু তাঁহার চোখ দুইটির বৈশিষ্ট্য ছিল। উহা দেখিলেই বোঝা যাইত, তিনি অমিত শক্তির অধিকারী।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বরমাসে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এক 'স্বদেশী ডাকাতি'র ব্যাপারে। রেল কোম্পানির টাকা গাড়ীতে করিয়া পাহাড়তলীর পথে যাইতেছিল। অনন্ত সিংহ আর দেবেন দে-র নেতৃত্বে সেই টাকা লুঠ করা হইল।

সূর্য সেন আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন শহর হইতে অনেক দূরে একটা গ্রামে। বিপ্লবীরাও থাকিতেন সেখানে সাধারণভাবে। একদিন দেবেন দে দেখিলেন, দূরে পুলিসের লোক। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য সেন আর তাঁর পাঁচ সঙ্গী অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, আর লুঠ-করা টাকা লইয়া পুলিসের নজর এড়াইয়া পাহাড়ের দিকে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পুলিশ হইতে সূর্য সেনের নামে হুলিয়া বাহির হইল। ১৯২৫ সালে কলিকাতায় সূর্য সেন একদিন ধরা পড়িলেন। তারপর তাঁহাকে জেলে আটক করা হইল।

১৯২৮ সালে গান্ধীজীর পরামর্শে ইংরেজ-সরকার বহু রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সূর্য সেনও ছাড়া পাইয়াছিলেন।

মুক্তি পাইয়াই তিনি ফিরিয়া গেলেন চট্টগ্রামে। পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিলেন এক দুঃসাহসিক অভিযানের। অগ্নিযুগের ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র আক্রমণে চট্টগ্রাম দখল।

এই উদ্দেশ্যে তিনি গড়িয়া তুলিলেন ছোটখাটো একটি সৈন্যদল।

তাহাদের অস্ত্রশিক্ষা দিলেন পাহাড়ের নির্জন স্থানে। আহরণ করিলেন সরকারী বহু গোপন তথ্য। তাহার পর স্থির করিলেন এই কয়টি কার্যক্রম :

১। নিজাম পল্টনস্থ সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। ২। রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। ৩। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস আক্রমণ এবং উহাদের ধ্বংসসাধন করিয়া বাহিরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করা। ৪। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। ৫। সরকারী ট্রেজারী আক্রমণ করিয়া অর্থাদি লুণ্ঠন। ৬। জেলখানা আক্রমণ করিয়া কয়েদীদের মুক্তিদান। ৭। গহ্বরের বন্দুকের দোকানগুলি লুণ্ঠন। ৮। চট্টগ্রামে জাতীয় সরকার ঘোষণা।

এই দুঃসাহসিক অভিযানে অংগ্রহণ করিয়াছিলেন সর্বশুদ্ধ বাষট্টিজন বিপ্লবী। সূর্য সেন উহার সর্বাধিনায়ক। অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, উপেন ভট্টাচার্য নিযুক্ত হইলেন বিভিন্ন অভিযানের পরিচালক। পুলিশ আর্মারী আক্রমণের ভার ছিল অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষের উপর। লোকনাথ বল আর নির্মল সেন নিয়াছিলেন রেল আর্মারি আক্রমণের ভার। টেলিগ্রাফ আর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলের ভার দেওয়া হইয়াছিল অম্বিকা চক্রবর্তী আর উপেন ভট্টাচার্যের উপর।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। রাত্রি তখন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দশটা। অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন পাহাড়ের উপর অবস্থিত পুলিশ-অস্ত্রাগারের কাছে। তাঁহাদের পিছনে আসিতেছিলেন সূর্য সেন নিজে।

প্রথমে আসিল অনন্ত সিং। তাঁহার গুলিতে একজন প্রহরারত পুলিশ ধরাশায়ী হইল। তার পরেই সেই নিস্তব্ধ পাহাড় মুখর হইয়া উঠিল বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহু গর্জনে। বিপ্লবীরা ঢুকিয়া পড়িলেন অস্ত্রাগারে। বহু অস্ত্রশস্ত্র তাঁহাদের হস্তগত হইল।

অপর দিকে অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগারের সামনেও একই দৃশ্য। লোকনাথ বলেরা সেখানে মুষলধারায় গুলি চালাইয়া চলিয়াছেন।

একজন ইংরেজ অফিসার ছুটিয়া আসিতেছিলেন, বুলেটবিদ্ধ হইয়া তিনি ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহারা অস্ত্রাগারের দরজা ভাঙিতে পারিলেন না। সেখানকার সশস্ত্র প্রহরীরাও ততক্ষণে প্রস্তুত হইয়া প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগিল। পাছে ধরা পড়িতে হয় এই আশঙ্কায় বিপ্লবীরা নিরাপদেই ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় হাতের কাছে যাহা কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাইলেন তাহাই লইয়া আসিলেন।

অম্বিকা চক্রবর্তীর দলও ততক্ষণে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তারপর তাঁহারা পূর্বনির্ধারিত একটি জায়গায় মিলিত হইয়া রওনা হইলেন শহরের দিকে। হঠাৎ দেখিলেন, ওয়াটার ওয়ার্কস্ হইতে একটা স্থইস গান অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ করিয়া চলিয়াছে তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া। বাধ্য হইয়াই তাঁহারা আর অগ্রসর না হইয়া আশ্রয় নিলেন পাহাড়ের গুপ্ত স্থানে।

তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম দখল করা হইল না।

ইহার পরের ঘটনা ২২শে এপ্রিলের।

বিপ্লবীরা তখন আসিয়া আশ্রয় নিয়াছেন জালালাবাদ পাহাড়ে। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তুই দিক হইতে পুলিসের তুই বিরাট বাহিনী তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। তাঁহারাও প্রস্তুত হইলেন প্রতিরোধের জন্য।

বিকাল সাড়ে চারটার সময় শুরু হইল তুই দলের মধ্যে তুমুল লড়াই। অস্ত্রের গর্জনে অপরাহ্নের বাতাস ভারী হইয়া উঠিল।

কিন্তু মেশিনগানের আক্রমণের মুখে কতক্ষণ আর লড়াই চলে? এগারো জন বিপ্লবী প্রাণ দিলেন গুলির মুখে। চারজন আহত হইলেন সাংঘাতিক ভাবে বাকি সকলেই অসাধারণ কৌশলে পলায়ন করিয়াছিলেন।

তারপর সারা চট্টগ্রাম জুড়িয়া শুরু হইল পুলিসের অকথ্য দমন-পীড়ন। বিপ্লবীদের খোঁজে প্রতিটি বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর তাহারা তছনছ করিতে লাগিল। তরুণদের নির্বিচারে ধরিয়া নিয়া তাহাদের উপর চালাইতে লাগিল নির্মম নির্যাতন। অনন্ত সিংহের কানে উঠিল সেই খবর। ভাবিলেন, তিনি ধরা দিলে হয় তো নিরীহদের উপর

অত্যাচার বন্ধ হইতে পারে। এই ভাবিয়া স্বেচ্ছায় তিনি ধরা দিলেন পুলিসের কাছে। সুদূর চন্দননগরে কয়েকজন সঙ্গীসহ ধরা পড়িলেন লোকনাথ বল।

কিন্তু পুলিসের চাই সূর্য সেনকে। তাঁহাকে না পাইলে তাহাদের স্বস্তি নাই। ঐ দুর্ধর্ষ বিপ্লবীই তাহাদের চোখের ঘুম কাড়িয়া নিয়াছেন।

একদিন পুলিস খবর পাইল, সূর্য সেন আত্মগোপন করিয়া আছেন ধলঘাটের একটি বাড়ীতে। পুলিসের কাছে তাঁর মাথার দাম তখন দশ হাজার টাকা। পুলিসের কর্তা ক্যামেরন সাহেব সশস্ত্র বাহিনী লইয়া সেখানে হানা দিলেন।

মাস্টার দা-র সঙ্গে তখন আরো দুজন বিপ্লবী সেখানে ছিলেন। একজন নির্মল সেন, আর একজন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

পুলিশ দেখিয়াই তিন বিপ্লবীর আগ্নেয়াস্ত্র গর্জিয়া উঠিল। পুলিসও গুলি দিয়াই উহার জবাব দিতে লাগিল।

হঠাৎ একটি গুলি আসিয়া লাগিল নির্মল সেনের বুকে। প্রাণ হারাইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতার রিভলবার হইতে একটি তীব্র ঝলক বাহির হইয়া গেল ক্যামেরনকে লক্ষ্য করিয়া। চোখের পলকে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন ক্যামেরন সাহেব।

মাস্টারদা প্রীতিলতার হাত ধরিয়া টানিয়া একটা মই বাহিয়া বাড়ির পিছন দিককার জঙ্গলের ভিতর দিয়া পলাইয়া গেলেন।

কিন্তু মাস্টারদা শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়িলেন। লৌহ কপাটের আড়ালে বন্দী হইলেন মহানায়ক।

সেখানে গোপনে তাঁহার বিচার হইল। ভয়ে পুলিস তাঁহাকে প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করিতে সাহস পাইল না। বিচারে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইল।

ফাঁসির আগের দিন সন্ধ্যা ৭টায় চট্টগ্রাম জেল হইতে সূর্য সেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে বাণী দিয়া গিয়াছিলেন উহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"আমার শেষ বাণী আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলছে। এই তো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করবার সময়। হারানো দিনগুলিকে নূতন করিয়া স্মরণ করিবার সময়।

আমার ভাইবোনগণ, তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি: আমার বৈচিত্রহীন (কারাগৃহের) জীবনের একঘেয়েমীকে তোমরা ভেঙ্গে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময় পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্যে কী রেখে গেলাম? শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। একটি শুভ মুহূর্তে আমি প্রথমে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহ করে সারা জীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে কতটুকু সফল করতে পেরেছি। আমার আসন্ন মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনু-গামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও—যেমন আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের মধ্যে। বন্ধুগণ এগিয়ে চলো, কখনো পিছিয়ে যেয়ো না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আগত। উঠো। জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

১৯৩০ সালের ১৭ই এপ্রিল চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের কথা কোনোদিন ভুলো না। জালালাবাদ, জুল্‌ধা, চন্দননগর ও ধলঘাটের কথা সব সময় মনে রেখো। যেসব বীর সৈনিক স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁহাদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো।

আমার একান্ত অনুরোধ, এই সংগঠনকে তোমরা কোনোদিন ভেঙে দিও না। জেলের বাইরে ও ভিতরে সবার জন্যে আমার আশীর্বাদ ও ভালোবাসা রইল।

বিদায়!

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বন্দেমাতরম্!"

১৯৩৪ সালে ১৩ই জানুয়ারী ভোররাত্রে শহীদ হইলেন সূর্য সেন।

ইংরেজ সেদিন সূর্য সেনের মৃতদেহ দাহ করিবার সাহস পায় নাই। তাই তাঁহার মরদেহ ভারী পাথরে বাঁধিয়া চট্টলের প্রান্তবাহা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু তাহারা কি ভাসাইয়া দিতে পারিল বিপ্লবের আদর্শকে ? সে যে চিরজীবী। যেখানে বিপ্লব, সেখানেই সূর্য সেন।

অনুশীলনী

১। সূর্য সেন কোথায় এবং কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২। 'মাষ্টারদা' কাহাকে বলা হইত এবং কেন ? তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট সহকর্মীর নাম কর।

৩। সূর্য সেন চট্টগ্রামে জাতীয় সরকার ঘোষণা করিবার জন্য কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের প্রধান কারণ কি কি ?

৫। সূর্য সেন কিভাবে ধরা পড়িয়াছিলেন ? তাঁহার কত সনে ফাঁসি হয় ?

৬। সূর্য সেন কিভাবে ফাঁসির পূর্বের দিন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কি বাণী দিয়া গিয়াছিলেন ?

৭। ডান দিক হইতে সঠিক শব্দটি আনিয়া শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

(i) —চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল আত্মপ্রকাশ করে। (১৯২০/১৯২৩)

(ii) সূর্য সেন—সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ধরা পড়েন। (১৯৩২/১৯৩৩)

(iii) —সালের ১৩ই জানুয়ারী সূর্য সেনের ফাঁসি হয়। (১৯৩৪/১৯৩৫)

———

গোপীনাথ সাহা

একটা কথা আছে, মাঝে মাঝে ইতিহাসের না-কি পুনরাবৃত্তি ঘটে। কথাটা কিন্তু অগ্নিযুগের একটি ঘটনায় সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইল। সেইসব কথাই এখানে বলিতেছি।

তৎকালে কলিকাতার পুলিস-কমিশনার ছিলেন টেগার্ট সাহেব। 'অতি দক্ষ ব্রিটিশ রাজপুরুষ। ইংরেজের এত বড় মিত্র এবং বিপ্লবীদের এত বড় শত্রু তেমন একটা দেখা যায় না'। তিনি ছিলেন দুষ্টগ্রহ রাহুর মতো। তিনি শুধু বিপ্লবীদের পিছনে ধাওয়া করিতেন। তাহার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল বিপ্লবীদের জীবন।

তাই তাঁহারা স্থির করিলেন ঐ আপদকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতেই হইবে।

কিন্তু কে এই কাজের ভার নিবেন ?

গোপীনাথ সাহা আর দেবেন দে এই কাজের ভার নিলেন। খবর পাওয়া গেল, টেগার্ট রোজ ভোরে বেড়াইতে বাহির হয়। ঠিক হইল ঐ সুযোগেই খতম করিতে হইবে তাহাকে।

ঝুঁকিটা বড় কম নয়। কিন্তু গোপীনাথ একাই নিলেন সেই ঝুঁকি। সহ-বিপ্লবী দেবেন দে-কে ভুলাইয়া রাখিয়া আসিলেন তাঁহাদের আস্তানায়।

ছাতুর নাড়ু খাইতে খুব ভালোবাসিতেন গোপীনাথ। সেদিন খুব ভোরে উঠিয়াই দেবেনকে তিনি বলিলেন, "তুমি নাড়ু ক'টা তৈরী কর, আমি এই এলাম বলে।" এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী।

পৌষের শীতে ভোরের আলো ফোটে একটু দেরীতে। তখনো সেই আলো ফোটে নাই। আবছা অন্ধকার চারিদিকে রহিয়াছে। কলিকাতার একটি 'হোটেল-বার'-এর সামনে দাঁড়াইয়া আছেন গোপীনাথ। গাড়িতে করিয়া টেগার্টের সেখানেই নামিবার কথা—সেই চৌরঙ্গীতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অধীর প্রতীক্ষার অবসান হইল। একটি মোটর-

গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল হোটেলের সামনে। উহা হইতে একজন ইংরেজ পুরুষ বাহির হইয়া আসিল।

নিশ্চয়ই টেগার্ট। অমনি গোপীনাথের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জিয়া উঠিল। ইংরেজটির প্রাণহীন দেহ রাজপথে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু গোপীনাথ পালাইতে পারিলেন না। ধরা পড়িলেন। পরে জানা গেল, নিহত ইংরেজটি টেগার্ট সহেব নন। তিনি কিলবান কোম্পানীর একজন কর্তাব্যক্তি। নাম—মিস্টার ডে।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামও এমনি ভুল করিয়াছিলেন। কিংসফোর্ডকে মারিতে যাইয়া মারিয়াছিলেন মিসেস আর মিস কেনেডিকে।

এমনি করিয়াই বুঝি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে!

মামলার সময় আদালতে টেগার্টকে দেখিয়া গোপীনাথ তাঁহার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মারিবার জন্যে দুঃখও প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর টেগার্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "মিঃ টেগার্ট মনে রাখিতে পারেন যে, এই যাত্রা তিনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু তিনি জেনে রাখুন, আমার অসমাপ্ত কাজ কেউ-না-কেউ এসে সমাপ্ত করবেই।"

২৪শে ফেব্রুয়ারী মামলার রায় বাহির হইল—ফাঁসিতে মৃত্যু।

কানাইলালের মতো মৃত্যুর আগে গোপীনাথের দেহের ওজন পাঁচ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছিল।

১৯২৪ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলে ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়া গোপীনাথ বলিয়াছিলেন, "আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু বাঙলার মাটিতে বিপ্লবের বীজ বপন করবে।"

অনুশীলনী

১। টেগার্ট কে ছিলেন? তাহাকে হত্যা করিবার ভার কাহাদের উপর দেওয়া হইয়াছিল?

২। বিপ্লবীরা কেন টেগার্টকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন?

৩। গোপীনাথের ফাঁসি কবে এবং কেন হইয়াছিল, ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়া তিনি কি বলিয়াছিলেন?

৪। কে ছাতুর নাড়ু খাইতে ভালবাসিতেন?

———

বীর যোদ্ধা বিনয়-বাদল-দীনেশ


বিনয় বসু

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর।

কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস তখন কর্মচাঞ্চল্যে মুখর। এমন সময় একটি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল উহার সামনে। গাড়ি হইতে নামিলেন তিন তরুণ। বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত আর দীনেশ গুপ্ত বিনয় আসিয়াছেন মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহের বাড়ি হইতে। আর দীনেশ ও বাদল আসিয়াছেন নিউ পার্ক স্ট্রীটের একটা গোপন আস্তানা হইতে। গাড়ি হইতে নামিয়াই তাঁহারা ঢুকিয়া পড়িলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। সোজা আসিয়া উপস্থিত হইলেন কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল সিম্পসনের ঘরের সামনে।

মিঃ সিম্পসন। কুখ্যাত ঐ ইংরেজ-শাসকের অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাঁহার হাতে কত-যে দেশপ্রেমিক নির্যাতিত হইয়াছেন উহার হিসাব নাই। এমনকি, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহনও রেহাই পান নাই। সেই অত্যাচারীর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করিতে আসিয়াছেন তিন তরুণ বিপ্লবী।

দোরগোড়ায় বসিয়া প্রহরী। প্রথমত সে তাঁহাদের সামনে এক টুকরা কাগজ আগাইয়া দিল—"নাম ঠীকানা লিখ দিজিয়ে।"

সে জানিত না যে, তাঁহারা হইলেন বিপ্লবী। জানিত না যে, ওঁদেরই মধ্যে একজন—বিনয় বসু মাত্র একশো দিন আগেই ঢাকার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস মিঃ লোম্যানকে খুন করিয়া আসিয়াছেন আর গুলির ঘায়ে আধমরা করিয়া দিয়া আসিয়াছেন পুলিস সুপার মিঃ হাডসনকে।

কিন্তু না, তাঁহারা নাম ঠিকানা লিখিলেন না, কাগজের টুকরাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর—

তাঁহারা বেলা ১২টা ১৫ মিঃ—১২-৩০ মিনিটের সময় কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিসে (রাইটার্স বিল্ডিং) আসিয়া উপস্থিত হইলে কর্ণেল সিম্পসন তখন তাঁহার খাস মুন্সির (পারসন্যাল এ্যাসিস্টাণ্ট) সঙ্গে তাঁহার অফিসে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। যুবকত্রয় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে চাপরাসী তাহাদিগকে উপরি উক্ত কারণে অপেক্ষা করিতে বলে এবং কি কাজের জন্য তাঁহারা দেখা করিতে চায়, তাহা যথারীতি এক টুকরো কাগজে লিখিয়া দিতে বলে। কিন্তু যুবকগণ ইহা করিতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহাকে একপার্শ্বে ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্রুতগতিতে কর্ণেল সিম্পসনের প্রতি ৫।৬ বার গুলি নিক্ষেপ করে। গুলির আঘাতে কর্ণেল সিম্পসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।



বাদল গুপ্ত

কর্ণেল সিম্পসনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আততায়ীরা বারান্দা দিয়া চলিয়া আসেন। দৌড়াইবার সময় তাঁহারা অফিসগুলির কাচের জানালায় এবং সিলিং-এ গুলি করিতে থাকেন।

আততায়ীগণ তিনজনই ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিলেন। বারান্দা হইতে গুলি করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় তাঁহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতেছিলেন। অনতিবিলম্বে লালবাজারে এই খবর পৌঁছিয়া গেল।

কুখ্যাত পুলিস কমিশনার মিঃ টেগার্ট সাহেব সশস্ত্র গোরা পুলিস-বাহিনী লইয়া তিন তরুণকে গ্রেফতার করিতে ছুটিয়া আসিলেন।

উভয়পক্ষে রাইটার্সের দোতলায় চলিল অলিন্দ-যুদ্ধ। একদিকে

মৃত্যু জয়ের নেশায় উদ্দীপিত তিন তরুণ, বিনয়-বাদল-দীনেশ। অপরপক্ষে বিরাট পুলিস-বাহিনী। দুইপক্ষের গুলি বিনিময়ে মুখর হইল ডালহৌসি অঞ্চল। হঠাৎ একটি গুলি আসিয়া দীনেশের বুক বিদ্ধ করিল। দীনেশ হাসিমুখেই ধ্বনি তুলিলেন 'বন্দে মাতরম্'।



দীনেশ গুপ্ত

এইবার তাঁহারা একটি ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইংরেজের হাতে মরতেও যে তাঁহাদের ঘৃণা। তাই তাঁহারা সঙ্গে নেওয়া পটাসিয়াম সায়নাইড খাইলেন। বাদল একটু পরেই মৃত্যুবরণ করিলেন। দীনেশ-বিনয় এইবার নিজেদের পিস্তলে আপন মস্তক বিদ্ধ করিলেন। বাহিরে তখনো বেয়নেটধারী গোরা সৈন্য আর মিঃ টেগার্ট তিনতরুণকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

বাদল মারা গেলেও আহত দীনেশ আর বিনয়কে গ্রেফতার করিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। পাঁচদিন পরে—১৩ই ডিসেম্বর বিনয় সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু দীনেশ?

দীনেশের মৃত্যু অত সহজে হইল না। তিনি সারিয়া উঠিলেন। তারপর হইল তাঁর বিচার। রায়—ফাঁসিতে মৃত্যু।

১৯৬৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকার 'ডালহৌসি স্কোয়ার'-এর নাম বদল করিয়া নূতন নামকরণ করিলেন "বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ"। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিনকার অনুষ্ঠানে যে-পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছিলেন, উহার নাম 'মহাকরণে অলিন্দ যুদ্ধ'। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বাঙলার সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের তিন তরুণ সেনানী একযোগে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের মূল কর্মকেন্দ্র কলিকাতার

রাইটার্স বিল্ডিংস্ বা মহাকরণ আক্রমণ করেন। সেই আক্রমণে তৎকালীন দুর্ধর্ষ কারা-মহাধ্যক্ষ মিঃ সিম্পসনকে নিহত করিয়া এবং একাধিক উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে আহত করিয়া তাঁহারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নিজেদের অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া এই তরুণেরা সেদিন সুরক্ষিত মহাকরণের বুকে যে দুর্ধর্ষ ও অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়াছিলেন ইহার ফলে নির্যাতিত লাঞ্ছিত সমগ্র জাতি ফিরিয়া পাইয়াছে তার আত্মবিশ্বাস। এই দুঃসাহসিক তিন তরুণের প্রত্যেকেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কল্পে চরম আত্মত্যাগ করিয়া শহীদ হইয়াছিলেন। কিন্তু মুক্তিকামী মানুষের মনে আজও তাঁদের পবিত্র স্মৃতি রহিয়াছে অম্লান এবং সেদিন ম্রিয়মান পরাধীন জাতির চিত্তে যে সুগভীর দেশপ্রেম ও আত্মবিসর্জনের প্রেরণা তাঁহারা জাগাইয়াছিলেন উহার সামান্য স্মারকরূপে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে মহাকরণের সম্মুখস্থ ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করিয়া নতুন নামকরণ করা হইয়াছিল "বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ"।

"দেশের মুক্তিসংগ্রামে বাঙলার বিপ্লবী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইংরেজ শাসকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত, ইহার বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালী বিপ্লবীদের দান অবিস্মরণীয়। এই আন্দোলনের প্রথমার্ধে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন, যতীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, গোপীনাথ অনন্তহরি, প্রমোদ চৌধুরী প্রমুখ শহীদের আত্মদানে সমুজ্জ্বল।

বিপ্লবকালের শেষার্ধে ১৯৩০ সাল হইতে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গৌরবময় যুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় বহু শহীদের রক্তদানে বিপ্লবকালের এই শেষার্ধও গৌরবোজ্জ্বল। শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ বিপ্লবীযুগের এই শেষার্ধের তিনজন আত্মত্যাগী সৈনিক।"

অনুশীলনী

১। বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ কোথায় ?

২। বিনয়-বাদল-দীনেশ মহাকরণে কাহাকে হত্যা করেন এবং কেন ?

৩। বিনয় বসু ঢাকাতে (বাংলাদেশ) কাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং কেন ?

৪। বিনয় বসু কিভাবে মারা গিয়াছিলেন ?

৫। দীনেশ গুপ্তের পরিণতি কি হইয়াছিল ?

৬। দীনেশ মৃত্যুর পূর্বে কি ধ্বনি তুলিয়াছিলেন ?

৭। বাদল গুপ্ত কিভাবে মারা গেল ?

৮। টেগার্ট কে ছিলেন ?

৯। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বিপ্লবীর নাম কর।

১০। ডান দিক হইতে সঠিক শব্দটি আনিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) বিনয় বসু ঢাকায় — খুন করিয়া আসিয়াছেন। (লোম্যানকে / সিম্পসনকে)

(ii) কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার — (সিম্পসন / টেগার্ট)

(iii) — বিনয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (মেডিকেলকলেজ হাসপাতাল / রাইটার্সে)

বীর সেনানী নেতাজী সুভাষচন্দ্র



এই পৃথিবীতে প্রত্যহ অসংখ্য মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, অসংখ্য মানুষ ইহলোক ত্যাগ করিতেছে। কেহই উহার খবর রাখে না। কিন্তু উহাদেরই ভিতরে এমন এক-একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার যশোগৌরব পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়। আজ তোমাদের নিকট এমনি একটি মানুষের নাম করিব। তিনি আমাদের বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান। তাঁহার নাম সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি ১৮৯৭ সনে কটকে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জানকীনাথ বসু ও মাতার নাম প্রভাবতী দেবী।

ছেলেবেলা হইতেই সুভাষচন্দ্র দেশ ও দেশের মানুষকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। রোগীর সেবা করা এবং গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর করা ইত্যাদি ব্যাপারে তখন কটক শহরে ছেলেদের মধ্যে তাঁহার জুড়ি কেহ ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখে পড়িল ভারতবর্ষের ভয়াবহ ছবি—ক্ষুধায় কাতর, রোগে ম্লান, অশিক্ষায় মূঢ় ভারতবাসী দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। তখন ভারত ছিল ইংরেজদের অধীন।

ইংরেজরা ভারতের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উহাকে সর্বহারা করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন ইংরেজদের এদেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে আমাদের দেশবাসীর দুঃখ দূর হইবে না।

দেশের শিক্ষা সমাপন করিয়া আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র বিলাত গমন করিলেন। তিনি সেখানে উক্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত কৃতকার্য হইলেন এবং একটি ভাল চাকরিও পাইলেন। কিন্তু ভারতবাসীর উপর ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের দরুন তাহার মন বিষাইয়া উঠিল। তাই তিনি স্থির করিলেন ইংরেজের অধীনে চাকুরি

করিবেন না, দেশে ফিরিয়া দেশ ও দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

তখন ভারতবাসীরা স্বাধীনতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়াছে। তিনিও এই আন্দোলনে তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহাকে এজন্য বহুবার কারাবরণ করিতে হইয়াছে। অহিংসনীতিতে তাঁহার আস্থা ছিল না। কিছুদিন পর গান্ধীজীর সহিত তাঁহার মতভেদ দেখা দেয়। তখন তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন।

ভারতবাসীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ-সরকার বহুদিন পূর্বে কলিকাতায় 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। সুভাষচন্দ্র অন্যায়কে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার জীবনটাই ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বিকৃত ইতিহাসের এই স্মৃতিস্তম্ভ সরাইবার জন্য তিনি আরম্ভ করিলেন 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' আন্দোলন। তাঁহার আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার এই স্মৃতিস্তম্ভ সরাইয়া নিতে বাধ্য হইল। অতঃপর তিনি প্রকাশ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইল। এবার তিনি আমরণ অনশন শুরু করিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যহানির ভয়ে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে স্ব-গৃহে অন্তরিত করিলেন। তাঁহার গৃহের চারিদিকে কড়া পুলিশ পাহারা বসিয়া গেল।

সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র ভাবিলেন ইংরেজ এখন বিপর্যস্ত, সুতরাং ইংরেজকে এদেশ হইতে তাড়াইবার এখনই সুবর্ণ সুযোগ। এসময়ে ভারতে বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজ ভারত ত্যাগে বাধ্য হইবে।

হঠাৎ একদিন দেশবাসী পরম বিস্ময়ের সহিত শুনিল—সুভাষচন্দ্র ঘরে নাই। চতুর্দিকে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। ভারতের গোয়ান্দা বিভাগে চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাহারা তাঁহাকে ধরিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। কিন্তু কোথায় মিলিবে তাঁহার সন্ধান। তিনি রহস্যজনকভাবে ভারত হইতে বহুদূরে ইউরোপে চলিয়া গেলেন। তিনি বার্লিনে গিয়া হিটলারের

বন্ধু হিসাবে বাস করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন শুনা গেল তিনি বর্লিন হইতে ডুবোজাহাজে সিঙ্গাপুরে গিয়াছেন। তিনি সেখানকার ভারতীয় লোক ও সিপাহীদের লইয়া নূতন করিয়া এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। নূতন আশায়, নূতন উদ্যমে, তাহারা সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়াইল। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদের তাড়াইয়া স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। এই মুক্তিকামী সেবাদলের নাম হইল, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। তাহারা তাহাদের নেতা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলিয়া অভিবাদন করিল। বাংলার সুভাষচন্দ্র ভারতের নেতাজী হইলেন।

পবিত্র মাতৃভূমিকে বিদেশীর বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত এই সেনাবাহিনী ভারতের দিকে রওয়ানা হইল। মুখে তাহাদের এক ধ্বনি —"জয় হিন্দ"। চোখের সামনে এক পথ, "দিল্লী চলো"। তাহারা ভারতের প্রান্তসীমা মণিপুরে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাদের সহিত ইংরেজ-সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হইল। প্রকৃতি তখন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিল।

হঠাৎ আকাশে ঘন মেঘ দেখা দিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পথ-ঘাট সব জলে ডুবিয়া গেল। গোলাবারুদ জলে ভিজিয়া গেল। আজাদ-হিন্দ-বাহিনী সে সময় চূড়ান্ত ফল অর্জনে ব্যর্থ হইলেও সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর অন্তরে যে আশার আলো জাগাইয়া গেলন, ইহা নির্বাপিত করিবার সাধ্য ইংরেজ সরকারের ছিল না।

কিছুদিন পর শোনা গেল 'তাইহকু' বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কিন্তু নেতাজীর সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। ভারত আজ স্বাধান। ভারতের স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তাই ভারতবাসীর হৃদয়ে তাঁহার আসন চিরদিন অম্লান থাকিবে। তিনি আমাদের দেশের গৌরব, তিনি আমাদের চিরকালের প্রিয় নেতা নেতাজী সুভাষ। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি চির-অমর।

অনুশীলনী

১। স্থভাষচন্দ্রের পিতার নাম কি? স্থভাষচন্দ্র কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। স্থভাষচন্দ্রের 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?

৩। তিনি আই. সি. এস. পাস করিয়াও চাকুরী করিলেন না কেন?

৪। কোন্ অবস্থায় এবং কত সালে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন?

৫। স্থভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' বলা হইত কেন?

৬। নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' সম্বন্ধে কি জান?

৭। ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৮। ডান দিকের বন্ধনীর মধ্য হইতে সঠিক শব্দটি আনিয়া শূন্যস্থানে বসাও :—

(i) গান্ধীজীর সহিত স্থভাষচন্দ্রের মতভেদ হওয়ায় তিনি যে দল গঠন করিয়াছিলেন তাহার নাম —। (ফরোয়ার্ড ব্লক/স্বরাজ্যপার্টি)

(ii) তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে সৈন্যবাহিনী গড়িয়াছিলেন উহার নাম —। (আজাদহিন্দ বাহিনী/মুক্তিফৌজ)

———

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের চুরুলিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি পিতৃহারা হন। সতের বৎসর বয়সে তিনি দারিদ্র্যের তাড়নায় বিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া বাঙ্গালী পলটনে যোগদান করেন। তিনি সেখানে কিছুদিন হাবিলদারের পদে কাজ করেন এবং দক্ষতার পরিচয় দেন।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন হইতেই আরম্ভ হয় তাঁহার বাস্তব জীবন। তিনি নিপীড়িত ও রক্তক্ষত মানুষের কবি। শোষণকারীদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন—

"প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মানুষের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

জীবনে তিনি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন উহাকেই দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। রাজনৈতিক শৃংখল মোচনের তীব্র আবেগ তাঁহার বহু কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। দেশাত্মবোধক বহু সংগীত রচনা করিয়া তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন এবং উহাতে তাঁহার অকৃত্রিম দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান' ইত্যাদি 'অগ্নিক্ষরা কাব্যগ্রন্থ' স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচুর প্রেরণা দান করিয়াছে। এই গ্রন্থগুলি বাঙ্গালী তরুণদের মনে নবজোয়ারের কল্লোল তুলিয়াছিল। অগ্নিবীণা বাহির হইবার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'অাঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু' 'দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে উচিয়ে দে তোর বিজয়কেতন।' বলিয়া স্বাগত জানাইয়াছেন।

নজরুল ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাহাদের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। তাহারা শুধু তাঁহার রচিত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়া ক্ষান্ত

হন নাই, তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। তথাপি এই দেশভক্ত কবির লেখনী স্তব্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ কোন অবস্থাতেই স্তিমিত হয় নাই। "কারাগারের লৌহ কপাট" গান গাহিয়া কারাগারের সৌধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। কখনও বা কারা কর্তৃপক্ষের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অনশন করিয়া তিনি মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অমর লেখনীর সাহায্যে ঘোষণা করিয়াছেন, 'আমি সেই দিন হব শান্ত, যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।' তিনি বিদ্রোহী কবিরূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় পীড়িত হইয়া সাম্যের গান গাহিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলমানের মিলন-মন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থাকিয়া তিনি এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহী কবির শেষ জীবন বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি মস্তিষ্কের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ১৯৭৬ সনের ২৯শে আগস্ট তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নজরুল আজ ইহজগতে নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর চিত্তলোকে তাঁহার আসন চির অম্লান থাকিবে।

অনুশীলনী

১। নজরুল কে ছিলেন? তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কি জান?
২। তাঁহাকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয় কেন?
৩। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি সম্বন্ধে কি জান?
৪। তাঁহার শেষ জীবন কিরূপ ছিল?
৫। নজরুল কবে ইহলোক ত্যাগ করেন।

———

অগ্নিযুগের বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

এই পৃথিবীতে যুগে-যুগে অসংখ্য মানুষ জন্মগ্রহণ করে, অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ইহাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁহারা মরিয়াও অমর। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ডাকনাম ছিল রাণী।

এই অগ্নিকন্যার জন্ম হয় ১৯১১ সনে। পিতার নাম জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার এবং মায়ের নাম প্রতিভা দেবী।

প্রীতিলতা শৈশবকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা (বর্তমান বাংলাদেশ) ইডেন কলেজে আসেন এবং সেখান হইতে আই. এ. পাস করিয়া কলিকাতা আসেন এবং সেখানে বেথুন কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া চট্টগ্রামের কোন এক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজে যোগদান করেন এবং পরে সেই স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদে উন্নীত হন।

ভারতবাসীদের প্রতি ইংরেজদের অত্যাচারে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। তিনি ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃংখল হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই সময় মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে একটি বিপ্লবীদল গড়িয়া ওঠে। প্রীতিলতা উক্ত দলে যোগদান করিয়া মাষ্টারদার নেতৃত্বে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চালানো, গুলি ছোড়া ইত্যাদি কাজে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন।

মাষ্টারদা যখন তাঁহার পলাতক জীবনে ধলঘাটের সাবিত্রীগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন সে সময় একদিন প্রীতিলতা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। পুলিশ সেই সংবাদ পাইয়া ক্যাপটেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে সাবিত্রীগৃহ ঘেরাও করে। প্রীতিলতা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া রাইফেল লইয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হন এবং ক্যাপটেন ক্যামেরনকে হত্যা করেন।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার। সবে রাত্রির অন্ধকার শুরু হইয়াছে। মাষ্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতা পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান

ক্লাব আক্রমণ করিলেন। তাঁহার কি উৎসাহ। প্রবেশদ্বারে পাহারা দিতেছিল কয়েকজন অস্ত্রধারী পুলিস। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় প্রীতিলতা পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কয়েকজন সঙ্গীসহ ক্লাবের উপর আক্রমণ চালাইলেন। মুহূর্তের মধ্যে আনন্দ কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল। শুধু শোনা গেল ভয়ার্ত ইংরেজ নরনারীর আর্তনাদ। সশস্ত্র পাহারাদারেরা যে যেদিকে পারিল পলাইল। প্রীতিলতার নির্দেশে দুই দিক হইতে গুলি চালানো হইল বহু হতাহত হইল। এই খবর ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী আসিয়া হাজির হইল। প্রীতিলতা সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা সকলে এই স্থান ত্যাগ কর। আমার জন্য ভাবিও না। তখন বিপ্লবীদল নিরুপায় হইয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেলেন। প্রীতিলতা সৈন্যদের সহিত কিছুক্ষণ সংগ্রাম করিলেন। তাঁহার দেহ গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত হইল। তবু তাঁহার মুখে হাসি। তিনি বীর। গোরা সৈন্যদের হাতে ধরা দিবেন না। তিনি স্বেচ্ছায় বিষ পান করিলেন।

ইতিমধ্যে:মিলিটারি বাহিনী আসিয়া সেখানে পৌঁছিল। তাহারা প্রীতিলতার দেহ তল্লাসী করিয়া তাঁহার নিজের লেখা একটি বিবরণ পাইলেন। উহাতে লেখা ছিল, "আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি। আজকের অভিনয় তারই একটি অংশ। আমি এতদিন যে ভগবানকে পূজা করে এসেছি সেই ভগবানের নামে নিজেকে উৎসর্গ করলাম।"

এই বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগ বিফল হয় নাই। ভারতের বহু মহীয়সী নারী তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতমাতার শৃংখল মোচন করিবার জন্য আত্মাহুতি দিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবং শহীদ বিপ্লবীদের নামের তালিকায় তাঁহার নাম চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে।

অনুশীলনী

১। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কে ছিলেন? তিনি প্রথম কোথায় লেখাপড়া শিক্ষা করেন?

২। মাষ্টারদার আদেশে তিনি কিভাবে চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করিয়াছিলেন?

৩। প্রীতিলতা কিভাবে জীবন বিসর্জন দেন?